সমস্ত বস্তুই সদসদাত্মক,কোন বস্তুই বিশুদ্ধ সৎ পদার্থ নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে,সত্যভ্রম সদসদাত্মক প্রকৃতির অস্তিত্বের পরিচায়ক।

তাহার পরে সত্য জ্ঞান; মূল সত্য কি—সর্ব্ব জগতের মূলাধার কি—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময়েও এটা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে,মূল সত্য আছেই আছে—আপেক্ষিক সত্যের মূলে নিরবলম্ব স্বয়ম্ভূ সত্য না থাকিলেই নয়। এইরূপ অভ্রান্ত নিশ্চয়তাতে কি প্রকাশ পায়? না জ্ঞানের নিজ মাহাত্ম্য।—জিজ্ঞাসা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? জ্ঞানের অভাব-বোধ হইতে; অভ্রান্ত নিশ্চয়তা ঠিক্ তাহার উল্টা দিক্ হইতে—জ্ঞানের প্রভাব-বোধ হইতে—উৎপন্ন হয়। অভ্রান্ত নিশ্চয়তাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, জীবের অল্প জ্ঞানের অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞান জাগিতেছে—এবং সেই সর্ব্বজ্ঞানের প্রভাবেই জীবের অল্প জ্ঞান এবং প্রকৃতির সদসদাত্মক আপেক্ষিক সত্তা উভয়ই প্রাণ ধারণ করিতেছে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, অভ্রান্ত সত্য-জ্ঞান সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মের অস্তিত্ব-সূচক। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কাণ্টের দর্শন-গ্রন্থের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৈদান্তিক সত্যের একটি অন্তঃশিলা সরস্বতী নদী তলে তলে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু হইলে হইবে কি—এক সর্ব্বগ্রাসী সংশয় আসিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। পারমার্থিক সত্য ঐ যাহা দেখা গেল তাহা বাস্তবিক সত্য —বস্তুগত সত্য—না শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানগত সত্য, এইটির মীমাংসা করিতে গিয়া কাণ্ট অতলস্পর্শ সংশয়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যদি এমন হইত যে, আমাদের জ্ঞান একটা সৃষ্টিছাড়া বস্তু—আমাদের জ্ঞানের সহিত কোন বস্তুরই কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই—তাহা হইলে কাণ্টের ঐরূপ সংশয়ের অর্থ থাকিত। কিন্তু আমাদের জ্ঞান যখন ভিতরে ভিতরে সমস্ত প্রকৃতির সহিত এবং সমস্ত জ্ঞানের সহিত যোগ-সূত্রে আবদ্ধ—জ্ঞানই যখন সমস্ত জগতের সারাংশ এবং সমস্ত বাস্তবিকতার মূল, তখন জ্ঞান-গত পারমার্থিক সত্য কিসে যে অবাস্তবিক তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উল্টা আরো দেখা যায় যে, যাঁহারা বাস্তবিক সত্যের প্রয়াসী তাঁহারা ঐন্দ্রিয়ক অবভাসকে তুচ্ছ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই শরণাপন্ন হ'ন;—অবিদ্যার পথই অবাস্তবিক মৃগতৃষ্ণার পথ,জ্ঞানের পথই বাস্তবিক সত্যের পথ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্য ঐন্দ্রিয়ক সত্য নহে বলিয়াই কি তাহাকে অবাস্তবিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? তাহা যদি করিতে হয়, তবে শুধু তত্ত্বজ্ঞান কেন—বিজ্ঞানও এক-মুহূর্ত্ত-কাল টেঁকেন না। তাহা হইলে দাঁড়ায় যে, পৃথিবীকে কেহ ঘুরিতে দেখে নাই—অতএব পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহা সত্য নহে। এইরূপ আপেক্ষিক জ্ঞানের (মিশ্র জ্ঞানের) কথাতেই যখন আমরা বিশ্বাস না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা তাহা অপেক্ষা আরো কত না শ্রদ্ধেয়। কাণ্টের দর্শন হইতে সংশয়ের আবরণটি অপসারিত করিলেই আমরা অমূল্য সত্য-রত্নের দর্শন পাই—নচেৎ এমনি এক বিষম পাকচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া যাই যে, সেখান হইতে উদ্ধার পাওয়া দেবতারও অসাধ্য। বেদান্ত-দর্শনে ঠিক্ ইহার বিপরীত দেখা যায়; বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি সংশয় দূরে থাকুক—তাহার প্রতি শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি-ভূমি। কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিজ-মূর্ত্তি হইতে

মুখ ফিরাইয়া বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে তাহার ছায়া যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাকেই সর্ব্বস্ব করিলেন। একজন ছুতার মিস্ত্রী একটা হীরক অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছে; কিন্তু তাহা হীরক কি না তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, ইহাতে তো কাচ কাটিতে পারা যায়—আপাততঃ এই ঢের! একজন জহরী সেই হীরকটি পাইয়া তাহাকে আপনার কণ্ঠাভরণ করিয়া রাখিল। কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত-দর্শন ছুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কাণ্টের দর্শন ছুতার মিস্ত্রী, বেদান্ত-দর্শন জহরী; আর, ছুয়ের মধ্যে ঐক্য এই যে, কাণ্টের দর্শনও হীরক (পারমার্থিক সত্য) হস্তে পাইয়াছে, বেদান্ত দর্শনও তাহা হস্তে পাইয়াছে। কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিয়া গাঁথাইলেন—বেদান্ত দর্শন বিশুদ্ধ জ্ঞানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন। এক যাত্রায় কত না পৃথক ফল! বেদান্ত দর্শনের সকল কথা সবিস্তরে বলিতে গেলে বৃহৎ এক পুস্তক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা না করিয়া আমরা যত সংক্ষেপে পারি তাহার সার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করিয়াই এবারকার মতো ক্ষান্ত হইব।

বেদান্তের পথ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই;—এপারে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, ওপারে ব্রহ্ম-জ্ঞান, মাঝখানে ভ্রম-নদী। ভ্রম-নদী একই নদী—ও-পার হইতে দেখিলে তাহা ঈশ্বরের ঐশী-শক্তি, এ-পার হইতে দেখিলে তাহাই জীবের অবিদ্যা। ভ্রম নদী পার হইয়া ও-পারে যাইতে হইবে—তাহার উপায় অবলম্বন করাই সাধন। ভ্রম-নদীর ও-পারে পোঁছিলেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয় হয় এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়; ইহাই মুক্তি।

বেদান্তের এই যে, পথ-বৃত্তান্ত—বিবেচনা করিয়া দেখিলে—ইহা এক দিনের পথ-বৃত্তান্ত;—অবশ্য ব্রহ্মার এক দিন। এ কেবল সঙ্গীতের নীচের সা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া এক সপ্তক পার হইয়া উপরের সা'য়ে যাওয়া; কিন্তু সপ্তকের উপর সপ্তক রহিয়াছে—জিজ্ঞাসা'র উপর জিজ্ঞাসা রহিয়াছে—ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপর ব্রহ্মজ্ঞান রহিয়াছে—মুক্তির উপর মুক্তি রহিয়াছে; তবে কি না—এক সপ্তকের সন্ধান জানিতে পারিলেই সামান্যতঃ সকল সপ্তকেরই সন্ধান জানিতে পারা যায়—সৌর-জগতের সন্ধান জানিতে পারিলেই সামান্যতঃ সকল জগতেরই সন্ধান জানিতে পারা যায়। অতএব, বিজ্ঞানকে কম্‌টি এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে, সৌর-জগতের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই—সৌর-জগতের বৃত্তান্তটিই ভাল করিয়া জান, এটি অতি সৎপরামর্শ তাহাতে আর ভুল নাই। আমরা তাই বলি যে, বেদান্ত এক সপ্তকের বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন—ভালই করিয়াছেন, কেননা সাধনের পক্ষে সেইটুকুই কেবল প্রয়োজন,—তাহার অধিক আপাততঃ কাহারো কোন কাজে লাগিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীবের মুক্তি হইবে—এইটি বুঝিলেই মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনে যত্নবান্ হইতে পারে; ইহার উপরে অধিকন্তু এইটুকু কেবল টীকা করা আবশ্যক যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্যমেই যে, সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জিত হইবে ইহা অসম্ভব। প্রথম উদ্যমের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রথম উদ্যমেরই ব্রহ্মজ্ঞান—প্রথম উদ্যমেরই মুক্তি—উপার্জ্জিত হইতে পারে। তাহার পরে দ্বিতীয় উদ্যমের জিজ্ঞাসার পর দ্বিতীয় উদ্যমের মুক্তি—

এইরূপ তৃতীয়—চতুর্থ—ইত্যাদি অনন্ত ব্যাপার প্রসারিত রহিয়াছে। জীবাত্মা সাধন-দ্বারা অবিদ্যা হইতে প্রথম-ধাপের মুক্তি লাভ করিলে পরমাত্মা যে তাহাকে কতখানি কৃতার্থ-করিবেন, তাহা পরমাত্মারই হস্তে। সুতরাং তাহা বলিবার কহিবার কথা নহে—তাহা বলিবার কহিবার অধিকার কাহারো নাই—ক্ষমতাও কাহারো নাই। তাহা সাধনের ব্যাপার নহে যে, তাহার কেহ উপদেশ দিবেন! তাহা উচ্ছ্বাসেরই ব্যাপার—পরমাত্মার স্বহস্তের ব্যাপার—প্রসাদামৃত-বর্ষণ! তাহা উপদেশের কোন ধারই ধারে না। ব্যাকরণ শিখিবার সময় কালিদাস অবশ্য আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শকুন্তলা লিখিবার সময় তিনি কাহারো উপদেশ গ্রহণ করেন নাই—তাহা যদি করিতেন তবে তাঁহার শকুন্তলা মহাভারতের শকুন্তলার দ্বিতীয় সংস্করন-মাত্র হইত, তাহার অধিক আর কিছুই হইত না। উচ্ছ্বাসের ব্যাপার উপদেশের বিষয় নহে, তাই বেদান্ত দর্শন এই বলিয়াই এক কথায় সংক্ষেপে সারিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি হইলেই—মুক্তি হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া উচ্ছ্বাসের ব্যাপার-টি কাহারো উপেক্ষনীয় হইতে পারে না। মনে কর যেন জীবাত্মা অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে—তাহা হইলে সে কোথায় যাইবে? অবশ্য পরমাত্মার ক্রোড়ে। এ অবস্থায়, জীবাত্মা যাঁহার প্রসাদে মুক্তি লাভ করিয়াছে তাঁহাকে কত না প্রীতি সমর্পণ করিবে—আর, তখনও কি পরমাত্মার অমৃত ভাণ্ডার ফুরাইয়া যাইতে পারে? জীবাত্মা যখন পরমাত্মাতে প্রীতি সমর্পণ করিতেছে,তখন পরমাত্মার ভাণ্ডারে কি প্রীতি-ধনের এতই অনটন যে, জীবাত্মার প্রীতির তিনি প্রত্যুত্তর-দানে অসমর্থ হইবেন? কখনই না! পরমাত্মার প্রেম-ভাণ্ডার অপরিসীম; তিনি আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই জীবাত্মাকে মুক্ত হস্তে ঢালিয়া দিবেন—জীবাত্মা তাহা গ্রহণ করিতে পারিলে হয়! তিনি আপনাকে পর্য্যন্ত ঢালিয়া দিবেন—অথচ তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার কোন কালেই ফুরাইবে না—"আর কিছুই দিবার নাই" এরূপ হইবে না, জীবাত্মারও "আর কিছুই গ্রহণ করিবার নাই" এরূপ হইবে না। তাই আমরা বলি যে, জীবাত্মার উত্তরোত্তর সাধনের পরিপাকাবস্থায় অবিদ্যার উত্তরোত্তর বন্ধনচ্ছেদ হয়; আর যখন যখন বন্ধন-চ্ছেদ হয় তখন তখনই জীবাত্মাতে পরমাত্মার প্রভাব বিকসিত হয় এবং প্রসাদ অবতীর্ণ হয়; এইরূপ—পরমাত্মার উত্তরোত্তর প্রসাদ-বর্ষণই জীবাত্মার উত্তরোত্তর মুক্তি।

সমস্ত বেদান্তের এবং কান্টের আদ্যোপান্ত সমন্বয় করিয়া দেখিয়া আমরা পাইতেছি যে,

প্রথমতঃ সত্য জিজ্ঞাসা জীবাত্মারই জিজ্ঞাসা—পরমাত্মার নহে; এইখানটিতে জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে ছায়াতপের প্রভেদ।

দ্বিতীয়তঃ সত্যজ্ঞান জীবাত্মার এবং পরমাত্মার উভয়েরই—মূলে তাহা পরমাত্মার এবং তাঁহার প্রসাদে তাহা জীবাত্মার। এই খানটিতে জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য।

তৃতীয়তঃ জীবের সত্য জিজ্ঞাসার অভ্যন্তরে যেমন সত্য জ্ঞান বীজ-ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তেমনি তাহার সত্য-জ্ঞানের অভ্যন্তরেও উচ্চতর সত্যের জিজ্ঞাসা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; পরমাত্মার সত্য জ্ঞান পরিপূর্ণ,

জীবাত্মার সত্য জ্ঞান আংশিক ; পরমাত্মার সত্য-জ্ঞান স্বরূপ-জ্ঞান, জীবাত্মার সত্য জ্ঞান তাহার আভাস মাত্র ; এইটি ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়েই বেদান্ত-দর্শন বলেন যে, পরমাত্মা স্বরূপ-চৈতন্য—জীবাত্মা আভাস চৈতন্য। এইখানটিতেই জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদাভেদ;—জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব—এইটিই উভয়ের অভেদ ; আর প্রতিবিম্ব অবশ্য মূল-জ্যোতি হইতে ভিন্ন—এইটিই উভয়ের প্রভেদ। অতঃপর বেদান্তের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা এবং প্রকৃতির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ এবং জীবাত্মার সাধন-পদ্ধতিই বা কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

বেহালা পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ কার্ত্তিক বুধবার ১৮১০ শক।

আজকাল অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে গৃহস্থের ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার নাই। তাঁহারা বলেন শাস্ত্রকারেরা অরণ্যবাসী ও সন্ন্যাসীদিগের পক্ষেই একমাত্র ব্রহ্মের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আর সংসারী গৃহস্থের পক্ষে দেবদেবীর অর্চ্চনা ও পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানই পর্য্যাপ্ত। বর্ত্তমানে লোকের এইরূপ সংস্কার। কিন্তু এইটি বড় ভ্রান্ত সংস্কার। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই, পরম কারুণিক প্রাচীন ঋষিরা যে সেই মুক্তির নিদান ব্রহ্মজ্ঞানে সংসারী গৃহস্থকে অনধিকারী করিয়াছেন ইহা নিতান্ত উন্মত্ত-প্রলাপ। মহর্ষি মনু এই ভারতভূমির ধর্ম্মসংস্থাপক ও সমাজ-সংস্কারক। বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং। মনু বেদোক্ত পথ হইতে রেখা মাত্রও পরিভ্রষ্ট হন নাই এই জন্যই স্মৃতিকারদিগের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বপ্রাধান্য। সেই মনু কহিয়াছেন—

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।

গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত আছে অপর ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা তৎসমুদায় কেবল জ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। সেই জ্ঞান এই যে, তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু উপনিষৎ, প্রমাণে জানেন যে একমাত্র পরব্রহ্মই পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবৎ বস্তুর আশ্রয়। মনুর যে প্রকরণে এই কথার উল্লেখ তাহার সমাপ্তিতে টীকাকার অতি পরিষ্কাররূপে কহিয়াছেন—

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানাময়ং বিধিঃ।

বেদসন্ন্যাসী অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণের প্রতি ইহাই বিধি। এক মনু প্রমাণেই প্রতিপন্ন হয় যে বেদবিহিত কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া গৃহস্থেরই ধর্ম্ম। তবে যে ইহার প্রতি ঔদাস্য তাহার কারণ আছে। ইন্দ্রিয়-দমন, ব্রহ্মে মতি ও রতি হইবার প্রধান কারণ। অবশ্য বাহ্য পূজায় ইহা উপেক্ষিত নয়। তাহাতেও সংযমের বিধি আছে। বলিতে কি, ব্যবহারত সেই বিধির উপর লোকের ততটা নির্ভর দেখা যায় না। কিন্তু যিনি ব্রহ্মলিপ্সু ইন্দ্রিয়দমন তাঁহার পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য। এমন কি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ব্যতীত কাহারই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে না। মনুষ্য প্রাণের তৃপ্তি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। এইটী তাহার অধীনতা। তাহার প্রতিস্রোতে যাওয়াই তাহার স্বাধীনতা। প্রাণের তৃপ্তির হেতু একমাত্র প্রকৃতি। বেদান্ত শাস্ত্র ইহাকে অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানের মুখ্য কার্য্যই

এই অবিদ্যানাশ অথবা প্রকৃতির বন্ধনচ্ছেদ। যতদিন অবিদ্যার অধীনতা তাবৎ আত্মা পরিস্ফুট হয় না। আত্মাকে পরিস্ফুট করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। ইন্দ্রিয় ইহার ব্যাঘাতক। ইন্দ্রিয়ই প্রকৃতির অতীত প্রদেশে মনুষ্যকে যাইতে দেয় না। এই জন্যই দেহে আমাদের আত্মবুদ্ধি। ইহাই প্রকৃত অধীনতা বা বদ্ধভাব। ইহার প্রতি-স্রোতে চল, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া দেহ-বন্ধন বা প্রকৃতির বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত কর তোমার আত্মা পরিস্ফুট হইবে। ফলতঃ অবিদ্যার আবরণ হইতে মুক্ত হওয়াই স্বাধীনতা। ইহার প্রথম কার্য্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। এইটী না হইলে ব্রহ্মে রতি ও মতি হয় না। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অতি কঠিন কার্য্য। এই জন্য বেদাদি শাস্ত্রে গৃহস্থের ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার বিধি থাকিলেও বাহ্য পূজায় সহজে তৃপ্তি পায় বলিয়া সে তাহাতে প্রাণমন সমর্পণ করে। কিন্তু প্রত্যেকের এই বেদবাক্য-টীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহ্যকৃতঃ কৃতেন, কৃত যে বাহ্য পূজা তদ্দারা অকৃত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্লবা-হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ। এই যে যাগ-যজ্ঞরূপ ভেলা তাহা নিতান্ত অদৃঢ়। ফলত যাবৎ তুমি অবিদ্যা বা প্রকৃতির বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত না করিবে তাবৎ তোমার রজতভ্রমে শুক্তিসংগ্রহই সার। তুমি প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বহুদূর।

কিন্তু নিরাশ হইবার কথা নয়। ঋষিরা গৃহস্থের ব্রাহ্মী মতি হইবার জন্য উপায়ও করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রধান ব্রহ্মচর্য্য। এই সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যের এক-স্থলে এইরূপ আছে

অনেক জন্ম বিষায়াভ্যাসজনিতা বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা ন সহসা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ইত্যতো ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনবিশেষোবিধাতব্যঃ।

যে বিষয়বাসনা আমাদের মনপ্রাণ সমস্ত অধিকার করিয়া আছে তাহা সহসা দূর করা সহজ নয় এ জন্য ব্রহ্মচর্য্য অনু-ষ্ঠানের আবশ্যকতা। ফলত ব্রহ্মচর্য্য একটী কঠোর ও কষ্টসাধ্য কার্য্য। সকল শাস্ত্রই কহিতেছে এতদ্ব্যতীত কেহ ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যানে অধিকারী হইতে পারে না। মনুষ্য যৌবনে প্রমাথী ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়ে। বি-ষয়ীর আত্মজ্ঞান ও তদভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। এই জন্য পূর্ব্বতন নিয়মে বাল্য হইতে অর্থাৎ শিক্ষাকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইত। এখনও প্রতি গৃহস্থের তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল নিয়মেরই দেশকালভেদে একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বে যে প্রণালীতে ইহা অনুষ্ঠিত হইত বর্ত্তমানে তাহা একরূপ অসম্ভব, তথাচ তাহার মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চল অবশ্যই ফল পাইবে। ব্রহ্মচর্য্যে শা-রীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শিক্ষা অনুস্যূত। পূর্ব্বকালে ভিক্ষাটন, গুরুর কাষ্ঠভার আহরণ, শিলাতলে একাকী শয়ন প্রভৃতি শারীরিক শিক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এখন সেই অতীতের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না কিন্তু ঋষিরা কহিতেন, তৈলপাত্রমিবাত্মানং দিধারয়িষেৎ, তৈল পাত্রকে যেমন যত্নে রক্ষা কর সেইরূপ যত্নে দেহকে রক্ষা কর। সুতরাং বাল্যা-বধি ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীর সবল করা আবশ্যক। মানসিক শিক্ষার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে কি দেশীয় কি বিদেশীয় যাহা সৎ শাস্ত্র যাহা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তাহার অনুশীলন কর। আর যেরূপ শক্তি তদনুসারে অল্পে অল্পে অধ্যাত্মিক শিক্ষা-লাভে যত্নবান হও। এতদ্ব্যতীত মধুমাংস

এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কুৎসিত নৃত্যগীতাদি হইতে আপনাকে দূরে রাখ। স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাবে দৃষ্টিপাত কর। সকল প্রকার লোভ সম্বরণ ও মিতাহার অভ্যাস কর। বেশভূষায় দীনভাব ও বিনয় রক্ষায় যত্নবান হও। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য। বাল্যাবধি এই মহাব্রত পালনে দৃঢ়তা থাকিলে তুমি যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, যখন সংসারের নানারূপ বাসনা তোমাকে প্রলোভিত করিতে থাকিবে তখন এই ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চ শিক্ষাই তোমার এক মাত্র রক্ষক। বিষয় অবশ্যই আসিবে কিন্তু এই শিক্ষার বলে অনাসক্তি তাহার দাসত্ব হইতে তোমায় মুক্ত রাখিবে। এই অনাসক্তের বিষয়ভোগই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মলাভের পূর্ব্ব সোপান, এই প্রসঙ্গে ধম্মপদ নামে এক খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ বড় সুন্দর উপদেশ দিয়াছে।

অপ্পমাদো মতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়ের ক্রীড়ামৃগ হইয়া থাকাই প্রমাদ। ইহা মৃত্যুর পদ। ফলত প্রমাদী যেরূপ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয় অপ্রমাদী সেরূপ হয় না। তুমি যদি প্রকৃতি বা অবিদ্যার বশীভূত হইয়া আত্মাকে পরিস্ফুট করিতে না পার তবে ইহাই তোমার অধ্যাত্মিক মৃত্যু। ব্রহ্ম এই মহা মৃত্যু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এই তো শিক্ষাকালের ব্রহ্মচর্য্য। ইহা গার্হস্থে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহা ব্যতীত গার্হস্থের যাহা বিধান আছে তাহাও বর্ত্তমানে অপরিহার্য্য, প্রত্যেক মনুষ্য পাঁচটী ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। দেবঋণ পিতৃঋণ ঋষিঋণ মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণ। আশৈশব যে শিক্ষা চলিতে ছিল তৎপ্রভাবে শরীর গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনের উপযোগী বল লাভ করিয়াছে। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মন বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে এবং আত্মা স্বাধীন। পূর্ব্ব শিক্ষা গার্হস্থ বিধান রক্ষায় তোমায় সক্ষম করিয়াছে। এখন তুমি ঐ পাঁচটী ঋণ হইতে মুক্ত হও। তোমার উপাস্য সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম। দিন দিন এই পাঁচটি ঋণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তুমি তাঁহাকেই পাইবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে সর্ব্বদা রত থাক ইহা জ্ঞানযোগে আত্মপ্রসারণ। পূর্ব্ব পিতামহগণ যে সকল সদাচার ও সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন বংশপরম্পরায় তাহা প্রচারিত কর ইহা শ্রদ্ধাযোগে লোকান্তরে আত্মপ্রসারণ। যে সকল লোক নিরন্ন জাতি ও বর্ণনির্বিশেষে তাহাদিগকে আশ্রয় দেও ইহা মৈত্রীযোগে আত্মপ্রসারণ। যে সকল পশু পক্ষী তোমার দয়ার একান্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তাহাদিগকে আহার দেও ইহা প্রীতিযোগে আত্মপ্রসারণ। আর যে দেবতা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত তাঁহাকে আত্মায় দেখিয়া জগতের সহিত আপনার যোগ নিবদ্ধ কর ইহা ধ্যানযোগে আত্মপ্রসারণ। উপাস্যের ধর্ম্ম প্রাপ্তির চেষ্টাতেই প্রীতির পরাকাষ্ঠা। এই পাঁচ ঋণমুক্তি তাহাই সাধন করিয়া দেয়। যাহা অবশ্য দেয় তাহাই ঋণ, তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া এই পাঁচ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছ। এক মাত্র ব্রহ্মকে ইহার অধিষ্ঠাতা জানিয়া এবং ইহাতে আপনাকে প্রতিবিম্বিত না দেখিয়া প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত ইহার অনুষ্ঠান কর ক্রমশ তোমার ব্রহ্মলাভের পথ পরিস্কার হইয়া আসিবে। কে বলে গার্হস্থে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। ইহা

কি কখন বিশ্বাস করিতে পার পরম কারুণিক ঋষিরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমে মুক্তি পথ রোধ করিয়াছেন? ইহা নিতান্ত নির্ব্বোধের কথা। ব্রহ্মজ্ঞান কোন অবস্থায় কাহারই পক্ষে সপ্রতিবন্ধ নয়। তবে ইহার জন্য আপনার অধিকার স্থাপন করা চাই। বাল্য হইতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া যত্ন পূর্ব্বক গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনে চেষ্টা কর অবশ্যই অধিকারী হইবে। চিত্তশুদ্ধির অনুরোধে বাহ্য পূজায় বৃথা কালক্ষেপ করিও না। ঋষিরা যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাতক নয়। ইহা নিশ্চয় জানিও অনধিকারেই উপধর্ম্মের সৃষ্টি। প্রাণপণে তাহা হইতে আপনকে রক্ষা কর ইহাই ঋষিগণের আদেশ ও উপদেশ।

প্রকৃত সময়েই এদেশে ব্রহ্মের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমরা পরাধীন আমাদের যা কিছু ছিল সমস্তই অন্যে বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে। দেশাবচ্ছিন্নে যে ধর্ম্ম প্রচলিত তাহাতে শাস্ত্রত না হৌক কিন্তু ব্যবহারত দেহ মন আত্মা এক প্রকার উপেক্ষিত। কিন্তু এই ঋষিসেবিত প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্মই ঐ তিনের উন্নতি ও মুক্তি লাভ। এই সার্ব্বজনীন নিত্য ধর্ম্ম ব্যতীত এ দেশের দুরবস্থা দূর হইবার উপায় নাই। তাই বুঝি ঈশ্বর কৃপা করিয়া যথা সময়ে এই দেশে এই ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। নিশ্চয় জানিও দেহ মন আত্মা এই তিনের সমান ভাবে উন্নতিতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব না পাইলে দেশের দুরবস্থা দূর হইবার নয়। এক্ষণে সকলে উত্থান কর জাগ্রত হও। এই ধর্ম্ম নিজের গার্হস্থ জীবনে আনিতে চেষ্টা পাও, এবং এই দেশের দ্বারে দ্বারে ইহা প্রচার কর। ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরই এই কার্য্যে তোমার সহায় হইবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞাপন।

ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতলগৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ
সরস্বতী তীর
১৮১০ শক।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৫৪৮ সংখ্যা মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯। ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, সত্য-জিজ্ঞাসাই জীবাত্মার বিশেষ পরিচয়-লক্ষণ। জীবাত্মা চায়—ঠিক সত্যটি জানিবে; কিন্তু প্রকৃতি তাহার পরিবর্ত্তে মোটা-মোটি একটা সত্য দিয়া তাহাকে ভুলাই-বার চেষ্টা করে—তৃষিত জীবাত্মার সম্মুখে জলের পরিবর্ত্তে মরীচিকা আনিয়া উপস্থিত করে। আত্মা বারম্বার প্রতারিত হইয়া অবশেষে প্রকৃতির প্রলোভনে যখন কিছু-তেই আর ভুলে না, তখন প্রকৃতি আত্মার উপরে চড়াও হইয়া আক্রমণ করে। বিড়াল-শিশুকে যেমন তাহার মাতা ক্রীড়া-চ্ছলে আক্রমণ করে (তাহার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল এই যে, আমার শাবকটি যুদ্ধ-বিদ্যা শিখুক)—প্রকৃতি-মাতা আত্মার সহিত ঠিক্ সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে প্রকৃতির ক্রীড়া বিপর্য্যয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মার সহ্য-গুণকে একেবারেই ধরাশায়ী করিয়া দেয়; তাহার কিছুকাল পরেই প্রকৃতি-

মাতা হাস্যময়ী অভয়-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্মার ক্রন্দনোদ্যত মুখে হাস্য ডাকিয়া আনেন। যতক্ষণ না আত্মা ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়া শিখিয়া এরূপ শক্ত সমর্থ হয় যে, আর সে বিভীষিকাতেও ভয় পায় না—ছলনাতেও ভুলে না, ততক্ষণ প্রকৃতি-মাতা তাহাকে ভয় দেখাইতেও ছাড়েন না—ছলনা করিতেও ছাড়েন না। প্রকৃতি আত্মার "মাতা পরমকো গুরুঃ।" বিড়াল-শিশুকে তাহার মাতা বাস্তবিক কিছু আর বধ করিতে পারে না—যেন বধ করিতে যাইতেছে এইরূপ একটা ভান করে—এই পর্য্যন্ত; প্রকৃতি মাতা আত্মাকে কিছু আর বিনষ্ট করিতে পারেন না— "নায়ং হন্তি ন হন্যতে,"—কেবল আত্মাতে ঐরূপ একটা ভ্রান্তির সঞ্চার করেন। প্রকৃতি-মাতার মর্ম্মগত অভিপ্রায় এই যে, আত্মা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক—আমার বিরুদ্ধে আপনার প্রভাব ব্যক্ত করুক— এইরূপে ক্রমে শক্ত সমর্থ হউক। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যুদ্ধের পরে শান্তি লাভ করিলে তবেই আত্মা শান্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে—ভ্রমের পরে সত্য লাভ করিলে তবেই আত্মা সত্যের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। অতএব প্রকৃতির বিভীষিকাও অমঙ্গল নহে, ছলনাও অমঙ্গল নহে, প্রত্যুত তাহা মঙ্গলেরই অব্যর্থ সোপান।

বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, তাহা ঈশ্বরেরই ঐশী-শক্তি—মায়া। পরমাত্মাই সৎ-স্বরূপ— অর্থাৎ অনন্য-সাপেক্ষ নিরবলম্ব স্বয়ম্ভূ সত্য; প্রকৃতি সদসদাত্মক—অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্য—ছায়া-সত্য। সাংখ্য-দর্শনের মতে প্রকৃতি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা। আমরা অতঃপর দেখাইতেছি যে, সদসদাত্মক এবং ত্রিগুণাত্মক এ দুইটি বাক্যের অর্থ একই—কি? না আপেক্ষিক সত্য।

সত্ত্বরজস্তমোগুণ আমাদের দেশের আপামর সাধারণ সকলেরই মুখে অনর্গল শুনিতে পাওয়া যায়। কথায় কথায় লোকে বলে—অমুকের বড় তমো হইয়াছে; সাত্ত্বিক আহারে শরীর বড় ভাল থাকে; রাজসিক আচার ব্যবহার যোদ্ধাদেরই মানায় ভাল; ইত্যাদি। কিন্তু বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি—সত্ত্বরজস্তমোগুণ যে ব্যাপারটা কি, কেহই তাহা আমাদিগকে আজ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। আমরা প্রামাণিক রকমে বুঝিতে চাই, তাঁহারা আমাদিগকে শাস্ত্রীয় রকমে বুঝা'ন;— অমুক টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, অমুক ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—কেহ বলেন উহা আর কিছু নয়— ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কেহ বলেন—জল বায়ু অগ্নি,—এই পর্য্যন্তই সার। ভাগ্যে কাণ্ট্ এবং তাঁহার পরে হেগেল্ জন্মিয়াছিলেন—তাই রক্ষা। লোকে বলে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, আমরা আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—আমরা দেখিতেছি যে, হেগেলে কপিলে কোলাকুলি! হেগেলের এবং কপিলের দোঁহার দুইটি মূল কথার মধ্যে পরমাশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে—সত্ত্ব রজস্তমো যে, ব্যাপারটা কি, এখন তাহা আমাদের নিকট জলের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে—তাহা এই;—

হেগেল্ তাঁহার প্রসিদ্ধ দর্শন-পুস্তকের গুণ-শিরস্ক প্রথম অধ্যায়ে অতীব নিপুণরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সত্তা (Being) অসত্তা (nothing) এবং বুভূষা (হইবার চেষ্টা (Becoming) এই তিনটি গুণ

সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি এক মুহূর্ত্তেই দেখিতে পা'ন যে, হেগেলের সত্তাগুণ এবং কপিলের সত্ত্ব-গুণ—হেগেলের অসত্তা-গুণ এবং এবং কপিলের তমোগুণ—হেগেলের বুভুষা গুণ এবং কপিলের রজোগুণ—একই ব্যাপার। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, সত্ত্ব-রজস্তমো গুণ বস্তুটা কি, তবে নিম্নে তাহা ভাঙিয়া বলিতেছি ;—

বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ আছে ; যেমন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব গুণ, পশুর পশুত্ব গুণ, কীটের কীটত্ব গুণ, ইত্যাদি। কিন্তু পশুত্ব-গুণের ভিতর মনুষ্যত্ব-গুণের অভাব রহিয়াছে, কীটত্ব-গুণের ভিতর পশুত্ব-গুণের অভাব রহিয়াছে ; প্রত্যেক বস্তুতেই একদিকে যেমন গুণ-বিশেষের সত্তা আছে, আর এক দিকে তেমনি গুণ-বিশেষের অভাব আছে ; আবার যাহারই অভাব আছে, তাহারই অভাব-পূরণের একটা-না-একটা চেষ্টা আছে (উদ্ভিদের যেমন—মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আলোকে উত্থান করিবার চেষ্টা) ; এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্তা, সত্তার অভাব এবং অভাব-পূরণের চেষ্টা তিনই পরিমাণ-বিশেষে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্তাই সত্ত্ব-গুণ, সত্তার অভাবই তমোগুণ এবং অভাব-পূরণের চেষ্টাই রজোগুণ। দীর্ঘ-প্রস্থ-বেধ যেমন পরস্পর-সাপেক্ষ, সাংখ্য-মতে সত্ত্ব রজ স্তমো গুণ সেইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ। পুষ্করিণী কত হাত দীর্ঘ, ইহা মাপিয়া দেখিলেই কিছু আর পুষ্করিণী মাপা হয় না ; তা ছাড়া—তাহা কত হাত চওড়া ও কত হাত গভীর তাহাও মাপিয়া দেখা আবশ্যক। তেমনি, কোন-একটি বস্তুকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে হইলে তাহাতে সত্তা (সত্ত্বগুণ) কতটুকু তাহা শুধু জানিলে চলিতে পারে না; তা ছাড়া—তাহাতে সত্তার অভাব (তমোগুণ) কতটুকু এবং সেই অভাব-পূরণের চেষ্টাই বা কতটুকু, তাহাও জানা চাই। যেমন ;—মনুষ্যে সত্তার ভাগ—সত্ত্ব-গুণের অংশ—পশু-অপেক্ষা বেশী ; কেননা, পশুতে মনুষ্যত্ব নাই; কিন্তু মনুষ্যে পশুত্বও আছে এবং তা ছাড়া পশুত্বের নিয়ামক মনুষ্যত্বও আছে; সুতরাং সত্তার ভাগ পশু অপেক্ষা মনুষ্যে দ্বিগুণ বেশী। মনুষ্যে, যেমন, পশু অপেক্ষা সত্তার ভাগ বেশী, তেমনি, দেবতা-অপেক্ষা সত্তার ভাগ কম ; কেননা, পশুতে যেমন মনুষ্যত্বের অভাব রহিয়াছে, মনুষ্যে তেমনি দেবত্বের অভাব রহিয়াছে ; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, পশুর তুলনায় মনুষ্য সত্ত্ব-গুণাত্মক, দেবতার তুলনায় তমোগুণাত্মক। আবার, মনুষ্যেতে দেবত্বের সেই যে অভাব, তাহার পূরণ-চেষ্টা বিষয়ী লোক অপেক্ষা সাধকমণ্ডলীতে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় ; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, দেবতার তুলনায় সাধক রজোগুণাক্রান্ত—বিষয়ী তমোগুণাক্রান্ত। মনুষ্যের সম্বন্ধে এ যেমন দেখা গেল, তেমনি—জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্ব-রজো এবং তমোগুণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাংখ্যের মতানুযায়ী মূল প্রকৃতি এবং দৃশ্যমান জগৎ দুয়ের মধ্যে ভেদাভেদ বুঝিতে হইলে নিম্ন-লিখিত উপমাটির প্রতি প্রণিধান করিলেই তাহা পরিষ্কার-রূপে বোধায়ত্ত হইতে পারিবে ;—

মনে কর একটি জ্যোতির্বিন্দু হইতে তিন বর্ণের তিনটি কিরণ-পুচ্ছ ত্রিধা বিকীর্ণ হইয়া দেয়ালের গাত্রে নিপতিত হইয়াছে ;—একটি পুচ্ছ পীত-প্রধান,

দ্বিতীয়টি লোহিত-প্রধান, তৃতীয়টি নীল-প্রধান। আবার, যে-টি পীত-প্রধান তাহার মুখ্য অংশ সুপীত, মধ্যম অংশ রক্তিম পীত, শেষাংশ নীলিম পীত; যেটি লোহিত-প্রধান, তাহার মুখ্য অংশ সুলোহিত, মধ্যম অংশ পীতিম লোহিত, শেষাংশ নীলিম লোহিত; যেটি নীল-প্রধান তাহার মুখ্য অংশ সুনীল, মধ্যম অংশ রক্তিম নীল, শেষাংশ পীতিম নীল। আবার সুপীতের মধ্যেও মুখ্য সুপীত, রক্তিম সুপীত, এবং নীলিম সুপীত রহিয়াছে; সুলোহিতের মধ্যেও মুখ্য সুলোহিত, পীতিম সুলোহিত, নীলিম সুলোহিত রহিয়াছে; সুনীলের মধ্যেও মুখ্য সুনীল, রক্তিম সুনীল, এবং পীতিম সুনীল, রহিয়াছে। অতএব সুনীলও ঐকান্তিক নীল নহে, সুপীতও ঐকান্তিক পীত নহে, সুলোহিতও ঐকান্তিক লোহিত নহে,—সমস্তই আপেক্ষিক ব্যাপার। সংক্ষিপ্ত নাম-করণের অনুরোধে আমরা পীত-প্রধান পুচ্ছটিকে পীত বর্ণ বলি, সত্ত্ব-প্রধান গুণকে সত্ত্বগুণ বলি; নীল-প্রধান বর্ণকে নীল-বর্ণ ও তমঃপ্রধান গুণকে তমোগুণ বলি; লোহিত-প্রধান বর্ণকে লোহিত বর্ণ এবং রজঃপ্রধান গুণকে রজোগুণ বলি। জ্যোতির্বিন্দু হইতে যেমন তিন বর্ণের তিনটি কিরণ পুচ্ছ বিকীর্ণ হইয়া কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভাবে কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিমিশ্র-ভাবে দেয়ালের গায়ে নিপতিত হইয়াছে; মূল প্রকৃতি হইতে তেমনি সত্ত্বরজস্তমো গুণ বিকীর্ণ হইয়া কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ-ভাবে কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিমিশ্র ভাবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে তিন বর্ণের তিনটি কিরণ-পুচ্ছ, যাহা দেয়ালে নিপতিত হইয়াছে, তাহা জ্যোতির্বিন্দুর অভ্যন্তর হইতেই তিন-রঙা হইয়া বাহির হইয়াছে; সুতরাং জ্যোতির্বিন্দুর অভ্যন্তরেও বিভিন্ন বর্ণত্রয় বর্ত্তমান রহিয়াছে—বলিতে হইবে; কিন্তু সেখানে কি ভাবে বর্ত্তমান—বিকীর্ণ ভাবে না সংকীর্ণ ভাবে? বিভিন্ন বর্ণত্রয় সেখানে অবশ্য অতীব সংকীর্ণ-ভাবে—সমাহিত ভাবে—অবস্থিতি করিতেছে; কাজেই সেখানে বর্ণ-ত্রয় মিলিয়া মিশিয়া শ্বেত বর্ণে একাকার। এইরূপ ন্যায়ে, দৃশ্যমান জগতে গুণত্রয় বিকীর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; মূল প্রকৃতিতে গুণত্রয় একাকারে সমাহিত রহিয়াছে। সাংখ্যকার তাই বলেন যে, মূল-প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ একাকার ভাব। হেগেল্‌ও তাঁহার দর্শন-গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বুদ্ধির মূল-প্রদেশে সত্তা এবং অসত্তা একীভূত।

সাংখ্য যেমন বলেন যে, প্রকৃতি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক, বেদান্ত তেমনি বলেন যে, মায়া সদসদাত্মক; সদসদাত্মক—অর্থাৎ প্রাকৃতিক সত্তা অসত্তা-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—সত্ত্বগুণ তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অতএব সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয়েরই এক বাক্য এই যে, প্রাকৃতিক সত্তা আপেক্ষিক সত্তা—স্বতন্ত্র সত্তা নহে। বেদান্তের মতে পরমাত্মাই বিশুদ্ধ সৎ পদার্থ—তিনিই সৎ স্বরূপ। যেমন মনুষ্য এবং মনুষ্যত্ব, তেমনি সৎ এবং সত্ত্ব; একটি বস্তু—আর-একটি গুণ। অসত্তার প্রতিযোগিতা (Contrast) ব্যতিরেকে কোন গুণই প্রকাশ পাইতে পারে না;—অন্ধকারের প্রতিযোগেই আলোক অভিব্যক্ত হয়, পশুত্বের প্রতিযোগেই মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত হয়, ইত্যাদি। এই জন্য, প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যে—সত্ত্বগুণের মধ্যে—রজস্তমোগুণের প্রতিযোগিতা অন্ত-

ভূ্ত। সাংখ্য ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা ত্রিগুণাত্মক ; বৈদান্তিক ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা সদসদাত্মক ; আধুনিক ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা আপেক্ষিক সত্য।

কিন্তু জীবাত্মার অন্তরে সমগ্র সত্যের ভাব রহিয়াছে—পরিপূর্ণ সত্যের ভাব রহিয়াছে, এই জন্য কোন আপেক্ষিক সত্যেই তাহার সত্য-জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না ; আধ পেটা অন্নে কাহারো পেট ভরে না। জীবাত্মা তাই তৃষিত নয়নে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির যবনিকা ভেদ করিয়া পরমাত্মার মুখাবলোকন করিতে সচেষ্ট হয় ; ইহারই জন্য জীবাত্মার তপজপাদি যত কিছু সাধন। অতঃপর সাধন কিরূপ এবং মুক্তিই বা কিরূপ তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক।

সাধনের প্রথম সংকল্প চিত্ত-শুদ্ধি ; এবং চরম সংকল্প ঈশ্বরের সহিত আনন্দ উপভোগ। প্রকৃতিকে সঙ্গ্রামে পরাস্ত করাই সাধনের প্রথম সংকল্প। প্রকৃতির সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতিকে ভাল করিয়া চেনা আবশ্যক। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ যে কেবল পঞ্চভূতই প্রকৃতি, তাহা নহে ; আমাদের অন্তরস্থিত মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও প্রকৃতিরই অন্তঃপাতী।

সাংখ্য-দর্শনের মতে মূল-প্রকৃতি হইতে সর্ব্ব প্রথমে "মহৎ" উৎপন্ন হয়। মহৎ এই শব্দটি শুনিবা-মাত্রই অপরিচ্ছিন্ন অনিরুদ্ধ সর্ব্বগত সত্তার ভাব মনে উদিত হয় ; কিন্তু প্রকৃতির অভ্যন্তরে সেরূপ সত্তা কোথায় ? প্রকৃতির সকল সত্তাই তো পরিচ্ছিন্ন সত্তা। এমন কি সমস্ত জগতের মূলে যে এক সর্ব্বময়ী প্রাকৃত সত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সংখ্য-শাস্ত্রে যাহার নাম মূল-প্রকৃতি, বেদান্ত-মতে তাহাও সদসদাত্মিকা আপেক্ষিক সত্তা—এই জন্য তাহাও সৎশব্দের বাচ্য নহে। বেদান্ত-শাস্ত্রে প্রকৃতি রূপকচ্ছলে পরমাত্মার চতুর্থাংশের একাংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা,— "একাংশেন স্থিতো জগৎ ;" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মার অসীম শক্তির কণাংশ মাত্র জগৎ কার্য্যে ব্যয়িত হয়। অতএব প্রকৃতি হইতে "মহৎ" যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে অপরিচ্ছিন্ন সত্তা নহে—তবে কি ? না তাহা অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সত্তা অর্থাৎ তাহা প্রকৃতি-জাত আর আর সত্তা অপেক্ষা অপরিচ্ছিন্ন ; যেমন—মৃত্তিকা অপেক্ষা জলের সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, জল অপেক্ষা বায়ুর সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ প্রকৃতি-জাত আর আর সকল বস্তু অপেক্ষা মহতের সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, এই পর্য্যন্ত। মহৎ সত্ত্ব-গুণ প্রধান—অর্থাৎ তাহাতে সত্তার ভাগই অধিক ; কিন্তু সে যে তাহার সত্ত্বগুণ—তাহাও রজস্তমোগুণের সহিত কতক না কতক অংশে জড়িত। এই মহত্তত্ত্বটির আর এক নাম বুদ্ধি। পাঠক হয় তো বলিবেন যে, এ আবার কিরূপ কথা! পাঠক একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—সন্দেহ নাই ; তিনি অবশ্য লাপ্লাসের আভ্রিক-সিদ্ধান্ত (Nebular theory) অবগত আছেন ; তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে, "প্রথমে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময় সত্তা—মোটা মুটি ধর যেন একটা ধূমাকার সত্তা—এটা বেস্ বুঝিতে পারা যায় ; কিন্তু তাহা যে, বুদ্ধি, এ কথার তো কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!" তাঁহার এ বোধ নাই যে, তিনি তাঁহার আপনার প্রশ্নের আপনিই উত্তর দিয়া বসিয়া আছেন! তিনি বলিয়াছেন "প্রথমেই অপরিচ্ছিন্ন সত্তা—এটা বেস্ বুঝিতে পারা যায়" তবেই হইল যে, অপরিচ্ছিন্ন

সত্তা বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, এখন দেখিতে হইবে যে, অপরিচ্ছিন্ন সত্তা শুদ্ধ কেবল বুদ্ধিতেই প্রকাশ পায়—তা' ভিন্ন—পরিচ্ছিন্ন সত্তার ন্যায় তাহা ইন্দ্রিয়-সন্নিধানে প্রকাশ পায় না। বর্ণ-গুণ বলিবা-মাত্রই বুঝায়—দৃষ্টিগোচর বর্ণ; সত্ত্বগুণ (বা সত্তা গুণ) বলিবা-মাত্রই বুঝায়—বুদ্ধি-গোচর সত্তা। বর্ণ দৃশ্য-বস্তুর দৃষ্টি-গ্রাহ্য গুণ, সত্তা বস্তু-মাত্রেরই বুদ্ধি-গ্রাহ্য গুণ। অদৃশ্য বর্ণের যেমন কোন অর্থ হয় না, অবোধ্য সত্তারও তেমনি কোন অর্থ হয় না। অতএব সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহৎ—যাহা ঈশ্বরের তুলনায় পরিচ্ছিন্ন কিন্তু প্রকৃতি-জাত সমস্ত বস্তুর তুলনায় অপরিচ্ছিন্ন—সেই অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময়ী প্রাকৃত সত্তা—বুদ্ধিরই অন্তর্ভূত। সকল প্রাকৃত বস্তুই বুদ্ধি-দ্বারা ব্যাপ্য কিন্তু বুদ্ধি আর কোন প্রাকৃত বস্তু-দ্বারা ব্যাপ্য নহে; সুতরাং আর আর সমস্ত প্রাকৃত সত্তা অপেক্ষা বুদ্ধির সত্তা অপরিচ্ছিন্ন; এই জন্যই বুদ্ধি মহৎ শব্দে সংজ্ঞিত হইয়াছে। কিন্তু ছায়া বা বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতিযোগিতা (Contrast) ব্যতিরেকে আলোক অভিব্যক্ত হইতে পারে না; তেমনি অসত্তার (তমোগুণের) প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে সত্তা (সত্ত্বগুণ) অভিব্যক্ত হইতে পারে না। অতএব, সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহতের অভিব্যক্তির জন্য তমোগুণ-প্রধান একটা কিছু আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক;—সাংখ্য-দর্শনের মতে সত্ত্বগুণ-প্রধান মহৎ (কি না বুদ্ধি) হইতে তমঃপ্রধান অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। চলিত ভাষাতেও—তমো বলিতে অহঙ্কার বুঝায়। বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে সত্তার ভাগ এত অধিক যে, তাহাতে তমো নাই বলিলেই হয়, আর, অহঙ্কারে অসত্তার ভাগ এত অধিক যে, তাহাতে সত্ত্ব নাই বলিলেই হয়। অভাব না থাকার নামই আনন্দ; এই জন্য সকল শাস্ত্রেই সত্ত্ব-গুণ আনন্দাত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের মতে—জগতের মূলস্থিত সেই যে, আনন্দাত্মক সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহৎ, তাহা ঈশ্বরেরই প্রভাব—ঐশীশক্তি বা মায়া; আর, বিষাদাত্মক তমোগুণ-প্রধান সেই যে অহঙ্কার, তাহা জীবের মর্ম্ম-গত অভাব—অবিদ্যা। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বেদান্ত মতে মায়া এবং অবিদ্যার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, সাংখ্য মতে মহৎ এবং অহংকারের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ; যথা; সাংখ্য মতে—প্রকৃতির মধ্যে যাহা অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময় সত্তা তাহাই মহৎ কি না বুদ্ধি; আর, যাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচ্ছিন্ন তাহাই অহংকার; বেদান্ত মতে—মায়া সমষ্টি-উপাধি, অবিদ্যা ব্যষ্টি উপাধি—অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচ্ছিন্ন। বুদ্ধিতে তমোগুণ সত্ত্বগুণের উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে—অহঙ্কারে সত্ত্বগুণ তমোগুণের উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ অহঙ্কারে তমোগুণেরই (অভাবেরই) সবিশেষ প্রাবল্য। অভাবের প্রাবল্য হইতে অভাব পূরণের চেষ্টা উৎপন্ন হয়,—সাংখ্যদর্শন তাই বলেন যে, তমঃপ্রধান অহংকার হইতে রজঃপ্রধান মন উৎপন্ন হয়; মন আর কিছু নয়—অভাব পূরণের জন্য আঁকবাঁকু—অধীর কামনা—সংকল্প বিকল্প—ছট্‌ফটানি। অহঙ্কার বুদ্ধির আলোক হইতে অবসৃত হইয়া আপনিটি এবং আপনারটি লইয়া, বিষাক্ত ফণীর ন্যায় গর্ত্তে ঢুকিয়া, অন্ধকারে জড়সড় হইয়া, চুপ করিয়া অবস্থিতি করে; আর, যখনই আলোকে বাহির হয়, তখনই সকলকে শত্রু জ্ঞান করে, ও অল্প কিছুতেই ফণা ধরিয়া উঠিয়া ফোঁস্ ফাঁস্ আরম্ভ করে। মন নীড়-স্থিত পক্ষি শাবক—

আলোকে উড্ডয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই পক্ষ বিস্তার করিতে থাকে—কিন্তু বারবার ভূতলে আছাড় খায়। আর অধিক চরিত্র বর্ণনা আবশ্যক করে না—ফল কথা এই যে, অভাব হইতে অভাবের পূরণ চেষ্টা উৎপন্ন হয়—অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হয়; সর্প হইতে পক্ষী উৎপন্ন হয়। মন অভাব-পূরণের জন্য অধীর; আর, তাহার প্রণালী পদ্ধতি এইরূপ; যথা;—পরিচ্ছিন্ন সত্তা-সকলের—একের যাহা আছে—অন্যের তাহা নাই; আবার, একের যাহা নাই অন্যের তাহা আছে;—সকলে যদি সদ্ভাবে সম্মিলিত হয়, তবে পরস্পরের সাহায্যে সকলেরই অভাব পূরিত হইতে পারে; অতএব অভাব পূরণের পদ্ধতি দুইরূপ (১) পরিচ্ছিন্ন সত্তা-সকলের মধ্যে যোগ-বন্ধন—ইহাতে করিয়া সমষ্টির প্রভাব-দ্বারা ব্যষ্টির অভাব-পূরণ হয়; এবং (২) মূল সত্তার প্রভাব স্ফুরণ—ইহাতে করিয়া সমষ্টির অভাব-পূরণ হয়। নীচে যোগ-বন্ধন হয় এবং উপর হইতে প্রভাব-স্ফুরণ হয়—দুইই এক সঙ্গে হয়—ইহাতেই ক্রমে ক্রমে অভাবের পূরণ হয়। অহঙ্কার আত্ম-পরের মধ্যস্থলে প্রাচীর সংস্থাপন করিয়া অভাবে আক্রান্ত হয়; মন আত্ম-পরের মধ্যে যোগাযোগ সংঘটন করিয়া অভাব পূরণের জন্য ব্যস্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্য দর্শনের মতে বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মন প্রকৃতি হইতে উত্তরোত্তর-ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সকলেই তাহারা প্রাকৃত পদার্থ। বেদান্ত দর্শনের মতেও, শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আনন্দ, সমস্তই প্রাকৃত ব্যাপার; ঐ পাঁচটি ক্রমান্বয়ে বেদান্তের অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ; ও-গুলি আত্মার উত্তরোত্তর উপাধি মাত্র—তা ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছুই নহে। এ বিষয়ে কাণ্ট্ কি বলেন—দেখা যা'ক্।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঈ-ধ্বনি যখন আমাদের কর্ণ-গোচর হয়, তখন সর্ব্ব প্রথমে হ্রস্বতম মুহূর্ত্তে হ্রস্বতম ই-ধ্বনি উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই হ্রস্বতম ই-ধ্বনিটি জ্যাতিমিতিক বিন্দুর ন্যায় অনির্ব্বচনীয়; তাহা আছে এবং নাই এই দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই জন্য তাহা সদসদাত্মক; তাহাকে জ্ঞানে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না—এই জন্য তাহা জ্ঞান-বিরোধী; তাহাতে ঈ-ধ্বনির সত্তা, অসত্তা, এবং চেষ্টা তিনই বীজ-ভাবে অন্তর্ভূত রহিয়াছে এই জন্য তাহা ত্রিগুণাত্মক। এইরূপ বীজভূত হ্রস্বতম ই-ধ্বনি পরম্পরার অভ্যন্তরে জ্ঞান আপনার ঐক্য সূত্র সঞ্চালন করিয়া বিশেষ একটি বিষয়—ঈ-ধ্বনি—গড়িয়া তুলে;—অবিদ্যাকে বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তুলে। কিন্তু সেই যে অবিদ্যা-নির্বিশেষ হ্রস্বতম ই ধ্বনি, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে বিন্দু বিন্দু করিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে কাহার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়? আমাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব নহে,—বহির্বস্তুরই কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। কিসে তবে আমাদের বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়? না অভ্যাগত অবিদ্যাকে যখন আমরা বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তুলি—হ্রস্বতম ই-ধ্বনি-গুলির মধ্যে ঐক্য-বন্ধন করিয়া ঈ-ধ্বনি গড়িয়া তুলি—তখন সেইরূপ ঐক্য বন্ধন-কার্য্যেই আমাদের বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। এইরূপে পাওয়া যাইতেছে যে, বহির্বস্তুর কর্ত্তৃত্বে অবিদ্যা ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বে তাহা বিদ্যারূপে পরিগঠিত হয়। বেদান্ত-মতে, ঐ যে বহির্বস্তুর কর্ত্তৃত্ব উহা

ঐশী-শক্তিরই প্রভাব—উহাই মায়া। অগ্রে ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে অবিদ্যা উপস্থিত হইলে, তবেই বুদ্ধি তাহাকে বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তোলে; অবিদ্যার উপস্থিত হওয়া-টি ঐশ্বরিক কার্য্য—তাহাতে বুদ্ধির আদবেই কোন হস্ত নাই; অবিদ্যা উপস্থিত হইলে পর—তখন বুদ্ধি তাহাকে বিদ্যা করিয়া গড়িয়া তোলে—এইখানটিতেই বুদ্ধির যাহা কিছু হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বুদ্ধির যত কিছু কার্য্য সমস্তই ঐশ্বরিক কার্য্যেরই প্রতিক্রিয়া – তাহা মূল-ক্রিয়া নহে। বুদ্ধির ক্রিয়া যেহেতু মূল-ক্রিয়া নহে—শুদ্ধ কেবল প্রতিক্রিয়া মাত্র; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধির ক্রিয়া প্রকৃতির ক্রিয়ারই প্রতিধ্বনি—সুতরাং তাহা প্রকৃতিরই অন্তঃপাতী। এইরূপ দেখিয়া শুনিয়াই কাণ্ট্—তাঁহার প্রথম গ্রন্থে—আত্মতত্ত্বকে যে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহার স্থান অন্বেষণ করিয়া পা'ন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি শুদ্ধ কেবল ধর্ম্মতত্ত্বের উপরে আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বুদ্ধি-তত্ত্বের উপরে কাণ্ট্ আত্মতত্ত্বকে দাঁড় করাইতে পিছ্‌পাও হইলেন কেন? তাহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, আত্মা প্রকৃতির বিরোধী পক্ষ—বুদ্ধি প্রকৃতির দলের লোক; কাজেই বুদ্ধির সাহায্যে আত্মা স্বরাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; ধর্ম্ম কিন্তু প্রকৃতির বিরোধী পক্ষ—এই জন্য ধর্ম্মের সাহায্যেই আত্মা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অতএব, আত্মা যে—অপ্রাকৃত বস্তু, এ বিষয়ে আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রসমূহের সহিত কাণ্টের—ভিতরে ভিতরে পরমাশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে।

আত্মা অপ্রাকৃত বস্তু—ত্রিগুণাতীত সদ্বস্তু; এক কথায়—পুরুষ; এবং জগতের আর সমস্তই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি। আত্মা পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়া—সুখ দুঃখে অবিচলিত হইয়া—সাক্ষীরূপে স্বপদে অবস্থিতি করিয়া—প্রকৃতির নাট্য লীলা দর্শন করিতে অধিকারী। আত্মা কূলে দাঁড়াইয়া দেখেন যে, প্রকৃতির যত কিছু ব্যাপার সমস্তই শুদ্ধ কেবল—ঈশ্বরের প্রভাব স্ফুরণ এবং জগতের অভাব পূরণ। প্রথমে ঈশ্বর-প্রভাব আকর্ষণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধারণতঃ সকল বস্তুর প্রভেদের মধ্যে অভেদ সংস্থাপন করে—এইটি প্রথম অভাব পূরণ;

তাহার পরে—প্রাণরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাখা পত্রাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ঐক্য সূত্র সঞ্চালন করে—ইহাতে স্বগত ভেদের মধ্যে প্রভেদ সংস্থাপিত হয়;—কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ তাহা স্বগত ভেদ। ইহাই দ্বিতীয় অভাব-পূরণ;

তাহার পরে—মনোরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বজাতীয় ভেদের মধ্যে অভেদ সংস্থাপন করে; কেননা, মাতা শাবকের মধ্যে, দম্পতির মধ্যে, যূথের মধ্যে, যেরূপ প্রভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ; প্রাণ যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্বগত ভেদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন করে, মন সেইরূপ স্ত্রীপুত্রাদি স্বজাতীয় ভেদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন করে;—ইহাই তৃতীয় অভাব পূরণ।

তাহার পরে ঈশ্বরের প্রভাব বুদ্ধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিজাতীয় ভেদের মধ্যে অভেদ সংস্থাপন করে;—বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের যেরূপ বিজাতীয় ভেদ, সেই বিজাতীয় ভেদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন করে; বুদ্ধির নিকটে "বসুধৈব কুটুম্বকং!" ইহাই চতুর্থ অভাব-পূরণ।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির

সমস্ত ব্যাপারই—(১) অভাব—তমোগুণ, (২) অভাব-পূরণের জন্য আকুবাঁকু—রজোগুণ, (৩) অভাব পূরণ—সত্ত্বগুণ; আবার (১) উচ্চতর অভাব (২) তাহার পূরণ চেষ্টা এবং (৩) তাহার পূরণ; আবার ততোধিক উচ্চতর অভাব—ইত্যাদি। এইরূপ করিয়া প্রকৃতির ত্রিগুণ-চক্র নিয়তই ঘূর্ণিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধি প্রকৃতির অন্তর্ভূত স্বতরাং তাহাও গুণ-চক্রে ঘূর্ণিত হইতেছে; জাগ্রৎকালে অভিব্যক্ত হইতেছে—নিদ্রাকালে বিলীন হইতেছে। কেবল, বুদ্ধির সাক্ষী-স্বরূপ যে, আত্মা, সেই আত্মাই কেবল গুণ-চক্রের বাহিরের বস্তু; আত্মা গুণ-চক্রে ঘূর্ণিত হয় না—পরন্ত স্থির ভাবে স্বপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া ত্রিগুণের নাট্যলীলা নিরীক্ষণ করে। আত্মা ত্রিগুণের অতীত অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়াই শাস্ত্রে তাহা নির্গুণ শব্দে অভিহিত হয়। শাস্ত্র-অনুসারে, বুদ্ধি হ'চ্চে সত্ত্ব-গুণ—আত্মা হ'চ্চে সদ্‌বস্তু। আত্মা এবং বুদ্ধির মধ্যে এইরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর প্রভেদ। সত্ত্বগুণ অবশ্য অসত্ত্ব-গুণ দ্বারা (তমোগুণ দ্বারা) কোন-না-কোন অংশে পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু সদ্‌বস্তু সত্ত্বাসত্ত্ব উভয়েরই মূলস্থিত—স্বতরাং অসত্তা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। সমস্ত প্রকৃতিই ত্রিগুণাত্মক—আত্মা ত্রিগুণাতীত অথবা যাহা একই কথা—নির্গুণ। সমস্ত প্রকৃতিই সদসদাত্মক গুণচক্র—আত্মা সদ্‌বস্তু। ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত বস্তু হইতে ত্রিগুণাতীত সদ্বস্তুকে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে আত্মা বস্তুর পরিবর্তে পুরুষ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। ত্রিগুণাতীত সদ্‌বস্তুই (আত্মাই) পুরুষ শব্দের বাচ্য।

এই স্থানটিতে কাণ্টের সহিত বেদান্তের অনৈক্য-একটি দেখা দিতেছে। কাণ্ট্ যেখানে আত্মাকে নির্গুণ বলিয়াছেন, সেখানে তাহার সঙ্গে এই একটি টিপ্‌পনী জুড়িয়া দিয়াছেন যে, নির্গুণ কিনা X—অর্থাৎ নিতান্তই অনির্দ্দেশ্য, কি যে তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহা বলিতে পারা যায় না—সত্য, কিন্তু বেদান্ত বলেন যে, তাহা ভিতরে ভিতরে জানিতে পারা যায়। ইচ্ছা দ্বারা কেমন করিয়া হস্ত-চালনা করিতে হয়—তাহা সকলেই জানে, অথচ কেহই তাহা অন্যকে বলিয়া বুঝাইতে পারে না। অনেক বিষয় এরূপ আছে, যাহা শুদ্ধ কেবল আপনি মনে মনে বুঝিবারই কথা—অন্যকে বুঝাইবার কথা নহে। বেদান্ত নির্গুণ আত্মাকে X না বলিয়া উল্টা আরো বলেন—স্বপ্রকাশ। আত্মা বুদ্ধি-দ্বারা প্রকাশিত নহে কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানে আপনাতে আপনি প্রকাশিত। এই ভাবটি আপনার মনের অভ্যন্তরে অতীব সহজে বুঝিতে পারা যায় কিন্তু অন্যকে বলিয়া বুঝানো বড়ই স্বকঠিন; কাজেই নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্তটির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল;—

ভূতল-শায়ী সূর্য্য-রশ্মি ছায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—কিন্তু সূর্য্যের নিজের গাত্রে লেশমাত্রও ছায়া স্থান পাইতে পারে না। ভূতল-শায়ী সূর্য্য-রশ্মি যেমন আলোক ছায়া এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যে জড়িত—বুদ্ধির প্রকাশ সেইরূপ সত্ত্ব তমো এবং রজোগুণে জড়িত। কিন্তু সূর্য্যের নিজ-গাত্রে যেমন ছায়া, বর্ণ বৈচিত্র্য বা ছায়াবচ্ছিন্ন আলোক স্থান পাইতে পারে না, তেমনি আত্মার আত্ম-প্রকাশে তমোগুণ বা রজোগুণ বা সত্ত্বগুণ স্থান পাইতে পারে না। যে আলোক সূর্য্যের গাত্রে তন্ময়ীভূত তাহা সূর্য্যকে ছাড়িয়া বাহিরে বিনির্গত হয় না—এই জন্য তাহা রশ্মি-শব্দের

বাচ্য হইতে পারে না। তবে কি? না যে আলোক সূর্য্য হইতে বিনির্গত হইয়া ছায়া এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যের যোগে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়, তাহাই রশ্মি শব্দের বাচ্য। তেমনি, বুদ্ধি-প্রকাশিত পরিচ্ছিন্ন সত্তাই সত্ত্বগুণ-শব্দের বাচ্য; ভূতলশায়ী সূর্য্যালোক যেমন ছায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—সত্ত্বগুণও তেমনি তমোগুণ-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু আত্মার স্বপ্রকাশ সত্তা যেহেতু তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে এই জন্য তাহা সত্ত্বগুণ শব্দের বাচ্য নহে। সূর্য্যের গাত্রে যে আলোক তন্ময়ী-ভূত তাহা রশ্মি-শব্দের বাচ্য নহে—তাহা স্বয়ংই সূর্য্য; তাহা হইতে যে আলোক বাহিরে বিনির্গত হয়—তাহাই রশ্মি; তেমনি, আত্মাতে যে স্বপ্রকাশ জ্যোতি তন্ময়ীভূত আছে, তাহা সত্ত্বগুণ নহে—তাহা স্বয়ংই আত্মা; কেবল, যে জ্ঞান-জ্যোতি আত্মা হইতে বুদ্ধিতে বিনির্গত হয় তাহাই সত্ত্বগুণ—তাহাই রজস্তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; যেমন—ভূতলশায়ী সূর্য্য-রশ্মি বর্ণ বৈচিত্র্য এবং ছায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সূর্য্যের নিজের গাত্রে তাহার রশ্মিপাত হয় না বলিয়া সূর্য্যকে কি আলোক-শূন্য তমঃপদার্থ বলিতে হইবে? আত্মা বহির্মুখী বুদ্ধির গম্য নহে বলিয়াই কি আত্মাকে জ্ঞান-শূন্য অ-চেতন বলিতে হইবে? কখনই না। রশ্মিই যদি জ্যোতিষ্মান হইল, তবে রশ্মির আকর যে, সূর্য্য, তাহা নিজে কত না জ্যোতিষ্মান্! রশ্মির আকর সূর্য্য যেমন জ্যোতির্ম্ময় প-দার্থ—বুদ্ধির আকর আত্মা তেমনি জ্ঞান-ময় পদার্থ; সূর্য্যও অদৃশ্য নহে—আত্মাও অজ্ঞেয় নহে। সূর্য্য আপনার গাত্রে রশ্মি-প্রয়োগ না করিয়াও জ্যোতিষ্মান্—আত্মা আপনার প্রতি বুদ্ধি-প্রয়োগ না করিয়াও স্বপ্রকাশ; তবে আর এ কথা কোথায় রহিল যে নির্গুণ আত্মা= X! আমাদের দেশের কোন শাস্ত্রই এরূপ কথা বলে না। সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশমান—আত্মা স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ; কোন শাস্ত্রই বলে না যে, আত্মা অপ্রকাশ তমঃ-স্বরূপ।

আত্মা কি অর্থে নির্গুণ এখন তাহা জলের ন্যায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। পৃথিবীতে সূর্য্যের রশ্মি-পতনই দিবা—রশ্মি-অপহরণই রাত্রি এবং উভয়ের সন্ধি-স্থলই সন্ধ্যা। সূর্য্যের নিজের গাত্রে রশ্মি-পতনও হয় না, রশ্মি-অপহরণও হয় না; অতএব সূর্য্য দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা তিনের মূলাধার হইয়াও নিজে দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত। সেই রূপ প্রকৃতিতে আত্মার জ্যোতিঃপতন সত্ত্বগুণ, জ্যোতিঃসংহার তমোগুণ, এবং উভয়ের সন্ধি-স্থল রজো-গুণ; সুতরাং জ্ঞানময় আত্মা সত্ত্বরজস্তমো গুণের মূলাধার হইয়াও নিজে সত্ত্বরজস্তমো গুণ-বিবর্জিত।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে নির্গুণ আত্মা বলিতে ত্রিগুণাতীত স্বপ্রকাশ সদ্‌বস্তু বুঝায়—অপ্রাকৃত পুরুষ বুঝায়, তা ভিন্ন—অনি-র্দ্দেশ্য X বুঝায় না।

সাধনের চরম সংকল্প পরমাত্মাকে আ-ত্মার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত বিমল আনন্দ উপভোগ করা; কিন্তু তা-হার জন্য চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব্বপ্রথমেই আব-শ্যক। চিত্ত-শুদ্ধি আর কিছু নয়—প্রকৃ-তির আকর্ষণ হইতে—বিষয়ের মায়াজাল হইতে—অবিদ্যা হইতে—আত্মাকে নি-র্মুক্ত করা। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, আত্মা যদি বিষয়াকর্ষণ হইতে—অবিদ্যার

হস্ত হইতে—একেবারেই পরিত্রাণ পায়, তবে তাহার কোন প্রকার অভাব থাকে না;—আত্মা শরীরাদির সহিত অকাট্য শৃঙ্খলে নিবদ্ধ বলিয়াই তাহার যত কিছু অভাব—শরীরাদি হইতে নির্লিপ্ত হইলে তাহার কোন অভাবই থাকে না; অভাব যদি না থাকিল, তবে কার্য্য কিরূপে থাকিবে? কেন না, অভাব-পূরণের জন্যই কার্য্যের যাহা কিছু প্রয়োজন। অভাবই যদি নাই—তবে কার্য্য কিসের জন্য? ইহার উত্তর এই যে, অবিদ্যা-মুক্ত আত্মা অভাবের উত্তেজনায় কার্য্য করে না—প্রভাবের উচ্ছ্বাসেই কার্য্য করে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সদসদাত্মক প্রকৃতি অভাব-পূরণের জন্য কার্য্য করে—অভাবের উত্তেজনাতেই কার্য্য করে; কিন্তু অবিদ্যা-মুক্ত বিশুদ্ধ আত্মার কোন অভাব নাই—তাহার কার্য্য তবে কিরূপ? ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতি সদসদাত্মক; প্রকৃতির সত্তা আপেক্ষিক সত্তা; কোন প্রাকৃত সত্তাই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—কাজেই কোন প্রাকৃত বস্তুই ভিন্ন বস্তু-দ্বারা চালিত না হইয়া কার্য্য করিতে পারে না,—সূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতিরেকে পৃথিবী ঘুরিতে পারে না। প্রকৃতি সদসদাত্মক আপেক্ষিক সত্য বলিয়াই তাহার কার্য্যের দশা এইরূপ। প্রকৃতি নিজে যেমন সদাসদাত্মক; তাহাকে যেমন সৎও বলিতে পারা যায় না—অসৎও বলিতে পারা যায় না; প্রকৃতির কার্য্যও তেমনি সদাসদাত্মক অর্থাৎ সৎও নহে অসৎও নহে। তেমনি আবার, অবিদ্যা-নির্মুক্ত আত্মা নিজে যেমন সদ্‌বস্তু—তাঁহার কার্য্যও তেমনি সৎকার্য্য। আত্মার স্বধর্ম্মোচিত কার্য্যে আত্মার সদ্ভাবই ব্যক্ত হয়—প্রভাবই ব্যক্ত হয়—অভাব ব্যক্ত হয় না। "আমার কোন অভাব নাই—আমি স্থির আছি" এইভাবে আত্মা আপনার অটল কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া কার্য্য করে—আপনার কার্য্যে আপনার প্রভাব সমর্থন করে। প্রকৃতির কার্য্য আর একরূপ;—"অন্যে আমাকে চালাইতেছে—আমি আপনি কিছুই নহি" এইভাবে প্রকৃতি আপনার কর্ত্তৃত্বে জলাঞ্জলি দিয়া কার্য্য করে—আপনার কার্য্যে আপনার অভাব ব্যক্ত করে। অতএব এরূপ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক যে, আত্মা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেই তাহা জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিবে। তাহা দূরে থাকুক্‌—বিবেচনা করিয়া দেখিলে উল্টা আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-আত্মার নিজের কোন অভাব নাই—নিদ্রা নাই তন্দ্রা নাই জরা নাই ব্যাধি নাই পাপ নাই তাপ নাই, সে আত্মার—জগতের অভাব-মোচনের জন্য শত গুণ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবারই কথা। এই টুকুই কেবল বলা যাইতে পারে যে, সে আত্মা অভাবের উত্তেজনায় কোন কার্য্য করিতে পারে না—অবিদ্যা-দ্বারা চালিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না; তা ভিন্ন—এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, সে আত্মার আদবেই কোন কার্য্য নাই। অবিদ্যা-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা যদি জগতের অভাব মোচনের জন্য আপনার প্রভাব ব্যক্ত না করিবেন—তবে কে তাহা করিবে? সূর্য্য যদি জগতের অন্ধকার অপহরণ করিবার জন্য কর-প্রসারণ না করিবেন তবে কে তাহা করিবে? অতএব আপনার অভাব ব্যক্ত করা যেমন প্রকৃতির স্বধর্ম্মোচিত কার্য্য, আপনার প্রভাব ব্যক্ত করা সেইরূপ আত্মার স্বধর্ম্মোচিত কার্য্য। প্রকৃ-

তির কার্য্যেতেই প্রকাশ পায় যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক আপেক্ষিক সত্য; এবং আত্মার কার্য্যেতেই প্রকাশ পায় যে, আত্মা ত্রিগুণের উপরের বস্তু, অপ্রাকৃত সদ্‌বস্তু; এক কথায়—পুরুষ। কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ একটি মন্তব্য কথা আছে;—বলিলাম বটে যে, অবিদ্যামুক্ত আত্মার কোন অভাব নাই কিন্তু—কিসের অভাব নাই? সদসদাত্মক—ত্রিগুণাত্মক—প্রাকৃত কোন কিছুর অভাব নাই। প্রাকৃত অভাব নাই বটে কিন্তু পারমার্থিক অভাব রহিয়াছে; ত্রিগুণাত্মক ভৌতিক অভাব নাই বটে কিন্তু গুণাতীত আধ্যাত্মিক অভাব রহিয়াছে—জ্ঞান-প্রেমের অভাব রহিয়াছে; যে অভাব দ্বারা সমস্ত প্রকৃতি চালিত হইতেছে—সে অভাব নাই; কিন্তু সে অভাব কোন প্রাকৃত বস্তুরই নাই—সে অভাব কেবল আত্মাতেই দেখিতে পাওয়া যায়—কি? না ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং ভগবৎ-প্রেমপিপাসা। যদি বল যে; ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত অভাব হইতে আধ্যাত্মিক অভাব—গুণেই না-হয় বড় কিন্তু জাতিতে তো অভিন্ন; তবে তাহার উত্তর এই যে,—না তাহা নহে—জাতিতেও তাহা বিভিন্ন। প্রাকৃত অভাব—থাকে এক স্থানে—এবং তাহার পূরণ হয় আর এক স্থান হইতে; ক্ষুধা উদরে,ধান্য—ক্ষেত্রে বা গোলায়। কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অভ্যন্তরেই ব্রহ্মজ্ঞান জাগিতেছে—ভগবৎ-প্রেমপিপাসার অভ্যন্তরেই ভগবৎ প্রেমানন্দ জাগিতেছে;—এখানে অভাব এবং প্রভাবের মধ্যে দেশকালের একটুও ব্যবধান নাই। পরমাত্মা যখন আত্মার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছেন—তখন সাধকের প্রেম-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহা পরিতৃপ্ত হইয়া বসিয়া আছে; শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন যে, দুর্যোধনাদি শত্রু-সকল মরিবার পূর্ব্বেই মরিয়া বসিয়া আছে। আধ্যাত্মিক অভাবের বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহা তাহার আপনার বাঞ্ছিত ধনের আপনিই ভাণ্ডার; আত্মা নিজেই পরমাত্মা-রূপ পরম ধনের ভাণ্ডার। এই কারণবশতঃ আধ্যাত্মিক অভাব অভাব-নামেরই অযোগ্য। আধ্যাত্মিক অভাব নহে—শুদ্ধ কেবল প্রাকৃত অভাবই তমোগুণ শব্দের বাচ্য। পারমার্থিক সম্বন্ধ প্রাকৃত সম্বন্ধের ঠিক্ উল্টা দিকে অবস্থিতি করে; মুক্ত আত্মা যখন প্রকৃতিকে বলে যে, তোমাকে আমার কোন আবশ্যক নাই তখন তাহার অর্থই এই যে, তোমার পর্দ্দার আড়ালে পরম পুরুষ যিনি বিরাজমান তাঁহাকেই আমার প্রয়োজন। প্রকৃতি হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবার অর্থই হ'চ্চে—অন্তরতম পরমাত্মার প্রতি মুখ ফিরানো। বিবেক এবং বৈরাগ্য দ্বারা আত্মাকে মার্জিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিলে—আত্মাকে অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্ত করিলে—আত্মা এমনি ভাস্বর হইয়া উঠে যে, তাহা হইতে জ্যোতিষ্কণা বিনিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে—তাহাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা; আত্মা এমনি রসার্দ্র হয় যে, তাহা হইতে অমৃত ধারা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে—তাহাই ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবৎ প্রীতি। সে জ্যোতিকেও প্রকৃতি আঁটিয়া উঠিতে পারে না—সে উচ্ছ্বাসকেও প্রকৃতি আঁটিয়া উঠিতে পারে না—পরমাত্মা স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলে তবেই মুক্ত আত্মার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। মুক্ত জীবের সহিতই বা পরমাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, আর, বদ্ধ জীবের সহিতই বা তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ, এখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। সংক্ষেপে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বদ্ধ জীবের সহিত পর-

মাত্মার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ; মুক্ত জীবের সহিত প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ। অথবা যাহা আরো ঠিক্—মনুষ্য যে অংশে বদ্ধ জীব অর্থাৎ শরীরী জীব, সেই অংশে পরমাত্মার সহিত তাহার আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ; আর, মনুষ্য যে অংশে মুক্ত জীব অর্থাৎ অশরীরী আত্মা, সেই অংশে পরমাত্মার সহিত তাহার প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ। পরমাত্মার আশ্রয়-নিকেতনে আমাদের ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত জন্ম হয়, এবং তাঁহার প্রেম-নিকেতনে আমাদের ত্রিগুণাতীত আধ্যাত্মিক জন্ম হয়। এই আধ্যাত্মিক জন্মেরই নাম মুক্তি।

প্রকৃতির দিক্ দিয়া পরমাত্মা আমাদের সাংসারিক নানা প্রকার অভাব পূরণ করিতেছেন, এবং মুক্তির দিক্ দিয়া তিনি আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। কেননা বন্ধন-ক্ষেত্রে প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না—মুক্তি-ক্ষেত্রেই (স্বাধীনতা ক্ষেত্রেই) প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইতে পারে। এক জন ক্রীতদাসকে বন্ধন করিয়া তাহার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক প্রীতি আদায় করিতে যাও দেখি—কখনই তাহা পারিবে না; কিন্তু তাহার বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান কর তাহা হইলে সে তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিবে। এমন কি, স্বাধীন-শব্দের অর্থই হ'চ্চে প্রেমের বাধ্য; পরাধীন শব্দের অর্থই হ'চ্চে বলের বাধ্য। অতএব মুক্তি-ক্ষেত্রই প্রেমের উর্ব্বরা ভূমি। জীবাত্মা অবিদ্যা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমাত্মাকে হৃদয়াভ্যন্তরে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিবে—এইটিই জীবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। শাস্ত্রের যাঁহারা খোসা চর্ব্বন করেন তাঁহাদের অনেকেরই এইরূপ একটি ভ্রম জন্মে যে, জীবাত্মা মুক্ত হইয়া আপনাতে আপনি জড়সড়ো হইয়া অজ্ঞানান্ধকারের অতলস্পর্শ গর্ত্তের অভ্যন্তরে নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে এটি মুক্তির লক্ষণ নহে—প্রত্যুত ঘোরতর তমোগুণের লক্ষণ। মৃগের প্রতি ব্যাঘ্রের দৃষ্টি একরূপ, শিশুর প্রতি মাতার দৃষ্টি আর-একরূপ; ব্যাঘ্রের দৃষ্টিতে মৃগের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়, মাতার দৃষ্টিতে শিশুর বুদ্ধির কলিকা বিকসিত হইয়া উঠে। পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় প্রেম-দৃষ্টিতে জীবাত্মার হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত হয়—জীবাত্মার অন্তরতম ভাব সকল বিকসিত হইয়া উঠে—সুবিমল আনন্দের অভ্যুদয়ে জীবাত্মার সমস্ত কামনা চরিতার্থ হয়; ইহারই নাম মুক্তি। যে মুক্তি হইতে ঈশ্বরাভিমুখে প্রীতি উৎসারিত হইয়া সমস্ত জগৎকে অমৃত ধারায় প্লাবিত করে, যে মুক্তিতে নিত্য নিত্য ঈশ্বরের নব নব কল্যাণ, নব নব করুণা, নব নব আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে থাকে, এবং ঈশ্বরের নব নব শোভা এবং সৌন্দর্য্যের কপাট উন্মোচিত হইতে থাকে; যে মুক্তিতে ঈশ্বর-প্রীতি কখনই পুরাতন হয় না—কিন্তু নব নব রাগে রঞ্জিত হইয়া, নব নব রসে পরিপূরিত হইয়া, নব নব আনন্দে উৎসারিত হইয়া, মুক্ত জীবকে মঙ্গল হইতে মঙ্গলতর—অন্তর হইতে অন্তরতর—ধামের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকে, সেই মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি।

সাধকের সাধন কেবল মুক্তি-পথের বিঘ্ন অপসারণ করিবারই জন্য; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপই মুক্তির প্রদাতা। কি প্রকারে পরমাত্মা জীবাত্মাকে মুক্তি প্রদান করেন—ইহা শুদ্ধ কেবল অন্তরে অনুভব করিবারই কথা,

মুখে বলিয়া বুঝাইবার কথা নহে; ইঙ্গিতচ্ছলে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বীর নেপোলিয়ন যখন ভীরুকে বীর করিয়া তুলিতে পারেন, ভক্ত চৈতন্য যখন ডাকাতকে ভক্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তখন মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মা যে, বদ্ধ জীবকে মুক্ত করিয়া তুলিবেন, –ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। অগ্নিই অঙ্গারকে অগ্নি করিয়া দেয়, কাচ-পোকাই আর্স্লাকে কাচ-পোকা করিয়া দেয়, আনন্দেই আনন্দ উদ্দীপন করিয়া দেয়; মুক্ত-স্বরূপই আত্মাকে মুক্ত করিয়া দেন।

প্রকৃত কথা এই যে, গৃহকে সুসজ্জিত এবং সুপরিষ্কৃত করা অতীব কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা করিলেও গৃহ উজ্জ্বল হয় না—প্রিয়তমের আগমনেই গৃহ উজ্জ্বল হয়; আত্মাকে অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্ত করা অতাব কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা করিলেও আত্মা মুক্ত হয় না—পরম প্রেমাস্পদের আগমনেই আত্মা মুক্ত হয়—রোগ-মুক্ত শোক-মুক্ত ব্যাধি-মুক্ত জরা-মুক্ত পাপ-মুক্ত তাপ-মুক্ত। ইহারই নাম মুক্তি।

মুক্ত জীব ঈশ্বরের সহিত উত্তরোত্তর নব নব আনন্দ উপভোগ করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে উন্নতিতে পদার্পন করে। বেদান্ত-শাস্ত্রের মতানুসারে মুক্ত জীব যে, ঈশ্বর হইয়া যা'ন না তাহার প্রমাণ—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যের উপসংহার-ভাগে বলিয়াছেন

"জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদ্ অণিমাদ্যাত্মকং ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি। জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্য সিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য।"

ইহার অর্থ;—জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপার ব্যতীত অণিমা-আদি আর যত প্রকার ঐশ্বর্য্য আছে সমস্তই মুক্ত পুরুষের অধিকারায়ত্ত; জগদ্ব্যাপার কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই কেবল অধিকারায়ত্ত। এইরূপ, বেদান্ত নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সহিত সাধনসিদ্ধ মুক্ত জীবের প্রভেদ স্বীকার করেন; কোন্ অংশে তবে ঈশ্বরের সহিত মুক্ত পুরুষের অভেদ? বেদান্ত বলেন—"ভোগসাম্যে।" অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরের সহিত কামনার সমস্ত ফল উপভোগ করে—আনন্দ হইতে আনন্দ—মঙ্গল হইতে মঙ্গল উপভোগ করে—এইখানেই ঈশ্বরের সহিত মুক্ত জীবের অভেদ। এইরূপ, অভেদের মধ্যে প্রভেদ এবং প্রভেদের মধ্যে অভেদ, ইহাই স্বদেশীয় বিদেশীয় সকল শাস্ত্রেরই মর্ম্মগত অভিপ্রায়। যাঁহারা ভেদাভেদের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন তাঁহারা এক-পক্ষের হইয়া আর-এক পক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন না; যাঁহারা প্রভেদ-শূন্য অভেদের অথবা অভেদ-শূন্য প্রভেদের পক্ষপাতী তাঁহারাই পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করেন।

উপদেশ।

(বলুহাটী সাম্বৎসরিক উৎসব)

নশ্বর পৃথিবীর অন্নপানে প্রতিপালিত হইয়া, অস্থায়ী যশোমান খ্যাতি প্রতিপত্তির ভিখারী হইয়া, ধন ঐশ্বর্য্য স্ত্রী পুত্র পরিবারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াও আজ আমরা কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম! এখানে কেন বিষয়ের দুশ্চিন্তা, বিষয়ীর সদর্প তীব্র কটাক্ষ আমারদের মর্ম্মস্থল প্রকম্পিত করিতে পারিতেছে না! কেন বা আমরা মান-অভিমান সম্পদ-বিভব বিস্মৃত হইয়া ধনী দরিদ্রে একাসনে আসীন হইয়া মহেশের যশঘোষণায় স্বরস্বতীতীর প্রতিধ্বনিত করিতেছি! বিষয়ের কীট হইয়াও কেন বা শ্মশানবৈরাগ্য

আমারদের অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিল! অজস্র কামনার বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়াও কেন বা দুরপনেয় গভীর শূন্য, হৃদয়-মধ্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া পড়িল! আজন্মকাল বিষয়মদিরা পানে যে দিশাহারা হইয়া পড়িয়া ছিলাম, অতি সন্তর্পণে আপনাকে ধর্ম্ম ঈশ্বর হইতে বহুদূরে রক্ষা করিয়াছিলাম, কে হৃদয়দেশ আলোড়িত করিয়া মোহ-যবনিকা আমারদের সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়া দিল! কে হৃদয়ের মত্ততা বিদূরিত করিয়া দিয়া বিষয় ভোগের চিরপরিচিত বর্ত্ম হইতে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিল, পথহারা দেখিয়া কল্যাণের পথে কে আমাদিগকে আহ্বান করিল! কে বলিয়া দিল যে ধরাপৃষ্ঠকে সর্ব্বস্ব জানিয়া জীবনের অর্দ্ধাঙ্ক সমাপিত করিলাম, উহা আমারদের তাবৎ নহে!

সকল মনুষ্যেরই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটি সময় উপস্থিত হয়, যখন বিষয়ের চির অভ্যস্ত আমোদ প্রমোদ তাহাকে আর আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। যখন ঘোরতর ঝটিকা প্রবল বেগে উত্থিত হইয়া পৃথিবীর উচ্ছেদদশা আনয়ন করে, মৃত্যুর করাল মুখব্যাদনে আত্মীয় স্বজন আমারদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন, যখন আপনার বলিয়া কাহাকেও গাঢ় আলিঙ্গনে সংবদ্ধ করিতে পারি না, যখন আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও নিরাশ্রয় জানিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকি, তখন বুঝিতে পারি যে পৃথিবী আমারদের সর্ব্বস্ব নহে, এখানকার সুখশান্তি আমোদ প্রমোদ আমারদের অন্তরের পিপাসা শান্ত করিতে সক্ষম নহে। সাংসারিক সুখের এই চির অতৃপ্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র হেতু। মনুষ্য ধ্রুব সত্যের ভিখারী। সংসার তাহার হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না বলিয়াই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পরিপূর্ণ আনন্দের দিকে ধাবমান হয়। যে আনন্দের ক্ষয় নাই, যে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলে আর তাহা হইতে কোন কালে বিচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, দেবতারা যে আনন্দের ভিখারী সেই দেব-উপভোগ্য আনন্দ লাভ করিবার জন্য মর্ত্ত্যের কীট ক্ষুদ্র মনুষ্যের আন্তরিক পিপাসা। সেই জন্যই আমরা পরিদৃশ্যমান অনায়াস-লব্ধ পার্থিব-সুখে বিসর্জ্জন দিয়া সাধন-লব্ধ কৃচ্ছ্র সাধ্য ভবিষ্যৎ-গর্ত্ত-নিহিত সুখের আশায় ইহকালের আমোদ প্রমোদকে আহুতি দিয়া অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছি, অবিদ্যার বিনাশে ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছি। যে জ্ঞান ঈশ্বরের পথের নিয়ামক তাহা লাভ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পার্থিব ও অপার্থিব উপাদানে মনুষ্য শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। রক্তমাংসঅস্থি-সমন্বিত স্থূলদেহ ধূলিকণিকায় পরিনির্ম্মিত, পৃথিবীর রসে পরিপুষ্টও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উহাকেই তাবৎ জানিয়া পরিশেষে জলবুদ্বুদের ন্যায় উহাতেই লীন হইয়া যাইতেছে। অপার্থিব উপাদান সমুদ্ভূত জীবাত্মা ক্ষুদ্র হইয়াও অপরিসীম ক্ষমতা ধারণ করে। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রসমন্বিত বিশাল পৃথিবী যেমন জড়শরীরস্থ ক্ষুদ্র চক্ষুর একমাত্র লক্ষ্যস্থল, সেইরূপ যিনি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের অন্তরাত্মা, যিনি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের নিয়ন্তা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র যাঁহাকে জানে না তিনিই জীবাত্মার একমাত্র গ্রাহ্য। চক্ষু আবশ্যক বল লাভ করিলে যেরূপ জড় পৃথিবীকে আপনার সম্মুখে দর্শন করে; জীবাত্মার অসাড়তা বিদূরিত হইলে—সংসারের নশ্বরতা তাহার নিকট প্রতিভাত হইলে উহা সাধন

তপস্যা বলে জ্বলন্ত ঈশ্বরকে আপনার সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখে ও পবিত্র পরিশুদ্ধ পরমাত্মাকে আপনার নিজস্ব ধন ও চরমগতি জানিয়া আপ্তকাম হয়। যদি সমুদায় সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়, যদি সূর্য্য চন্দ্র গগন হইতে অন্তর্হিত হয় তথাপি তাহার চক্ষু ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত হয় না।

যিনি সমুদয় জগতের অধিপতি, যাঁহার অসীম রাজ্যে একই কৌশল কার্য্য করিতেছে, তিনি চান যে তাঁহার প্রত্যেক সন্তান তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়। তিনি সেই জন্য তাঁহার অনন্ত উদার ক্রোড় সকলেরই জন্য আগ্রহের সহিত উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বিমল আত্মপ্রসাদ বিধান করিয়া তাঁহার প্রত্যেক দুর্ব্বল সন্তানকে তাঁহার দিকে অল্পে অল্পে আহ্বান করিয়া লইতেছেন। আমারদের বিপদ সম্পদেও তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন। প্রতি বিপদের দারুণ কশাঘাতে আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছেন। অণ্ড নিহিত শিশুকে পরিপুষ্ট জানিয়া যেমন পক্ষী, চঞ্চুর আঘাতে সেই অণ্ড ভেদ করিয়া দিয়া শাবককে মুক্তবায়ুতে আনয়ন করে, তেমনি যখনি আমরা সম্পদের আগারে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করি, আপনার আশা ভরসা এখানেই সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলি, তখনই বিশ্বজননী বিপদের তীব্র কুঠারাঘাতে ক্ষণ তৃপ্তিপ্রদ সুখের পার্থিব উপাদানগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন, আমারদের সম্মুখে নূতন রাজ্যের নূতন ভাবের নূতন কল্যাণের যবনিকা ক্রমে ক্রমে উন্মোচন করেন ও ধর্ম্মক্ষেত্রের বিশাল গগনে সঞ্চরণ করিবার শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিতে থাকেন। রজনীর ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হইলে যখন রক্তিম পূর্ব্বগগনে আরক্ত সূর্য্য স্বীয় কিরণ জাল বিস্তার করে, তখন আশু-প্রবুদ্ধ ব্যক্তি যেমন একেবারে নয়ন উন্মীলন করিয়া আলোকমালার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন না, প্রত্যুত ধীরে ধীরে অভ্যাস করিয়া লন, তেমনি আজন্ম-সহচর বিষয় হইতে মনুষ্য-হৃদয়কে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিবার সময়ে সেই পরমপিতা বিষয়ের অসারতা ক্রমশঃ দেখাইয়া দিয়া পরিশেষে তাহাকে আপনার পথের পথিক করেন। এ পৃথিবীতে যে না তাঁহার প্রেমের প্রেমিক হইল, তাঁহার অবিশ্রান্ত করুণা পরজগতে তাহার অনুসরণ করিবে। তাঁহার রাজ্যে ঘোর বিষয়ীরও নিস্তার নাই। বিষয়ী আর কতদিন তাহার অতুল্য সম্পদে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবে। তাঁহার দ্বার চির উন্মুক্ত, তাঁহার হস্ত চিরকার্য্যকর!

তাঁহার রাজ্যের চির-বিচিত্রতা দেখিয়া তাঁহার গুণগানে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত কর। তিনি মনুষ্যের সুখের জন্য পৃথিবীকে সুচিত্র ভূষণে অলঙ্কৃত করিলেন, আনন্দের কতশত উৎস উৎসারিত করিলেন। উপরে নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপে পৃথিবীর মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, নিম্নে ওষধি বনস্পতির লাবণ্যে ফলপুষ্পের মাধুরীতে, ইতস্ততঃ সঞ্চরমান পশুপক্ষীদিগের কলনিনাদে নিত্য বিশাল উৎসবে মর্ত্ত্যলোক উৎসবান্বিত করিয়া দিলেন! কিন্তু মনুষ্যের জন্য বৈরাগ্যের বীজ রোপণ করিতে বিস্মৃত হইলেন না। মনুষ্য তাঁহার নিত্য-উদার-সদাব্রতে অন্নপান লাভ করিয়াও চঞ্চল ঘটনার মধ্যে অস্থির অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া তাঁহাকে না পাইয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারিল না। সেই জন্যই আমরা অগণ্য সুখে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও হৃদয়ের অপূ-

র্ণতা পরিহারের জন্য তাঁহার দ্বারে তাঁহার আদেশে আগমন করিয়া প্রসাদ-বারির আশে তৃষিত চাতকের ন্যায় উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিয়াছি।

আমরা সংসারের অনিত্যতা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ দিগন্ত-বিশ্রান্ত উত্তাল তরঙ্গ-মালা-সমাকীর্ণ স্বরস্বতীর প্রখর তেজের অবসান হইয়াছে, তাহার সুগভীর ভীষণ গর্ত্ত বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে, উহার তলদেশে এই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত রহিল। ইহার প্রাণদাতা কালের করাল কুক্ষির মধ্যে স্থান পাইয়া অপার ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন। হয়ত আমাদের মধ্যে অনেকেই সংসারের আশা ভরসায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রান্তর মধ্যস্থ তরুর ন্যায় এককীই পৃথিবীর ঝঞ্ঝা তরঙ্গের আলোড়ন সহ্য করিতেছেন। হয়ত রোগ শোকের প্রবল আক্রমণে অনেকের দেহযষ্টি ক্ষীণ হইয়া ইহকালের পরপারের অব্যাহত যোগানন্দ প্রেমানন্দ সম্ভোগের উপযুক্ত হইতেছে। হয়ত বৈষয়িক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া অনেকের প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সুশীতল ছায়ার মধ্যে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছে। যাঁহারা ঈদৃশ বিপৎপাতের হস্ত হইতে বহুদূরে আছেন, তাঁহারা দুর্নিবার্য্য ঝটিকার কঠোরতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সহজে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হউন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এখানে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তিনি ভিন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কেহ নাই।

যতদিন শরীরের সঙ্গে আমারদের আত্মার যোগ ততকাল বিষয়ের নিকট হইতে আমরা চিরবিদায় গ্রহণ করিতে পারিব না; শরীরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিষয়ের অধীন হইয়াছি। আমরা প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান না হইয়া যাই, ইহারই জন্য আমাদিগকে নিয়ত সাবধান থাকিতে হইবে। চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে, ঈশ্বরকে হৃদয়ের প্রভু জানিয়া নিত্যনিয়মে তাঁহাকে প্রীতি উপহার প্রদান করিতে হইবে। তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া সংসারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ব্রহ্মযোজিতচিত্তে ফলকামনাশূন্য হইয়া অনাসক্ত ভাবে বিষয় উপভোগেই জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হইবে। পৃথিবীর সুখশান্তি অনিত্য জানিয়া এখানকার প্রতি পরিবর্ত্তনে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে।

আমারদের চারিদিকে অনিত্য বিষয়ের গণ্ডী। চারিদিকে বিষয় কোলাহল, নিরাশার ক্রন্দন, সম্পদের অট্টহাস্য! ইহার মধ্যে যোজিতচিত্ত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মধামের দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হওয়াই আমারদের লক্ষ্য। যখন আপনার ক্ষুদ্র বলের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করি তখন আর কোন আশা থাকে না। জীবনের অধিকাংশ কাল বিষয়ের সেবাতেই পর্য্যবসিত হইল। তিনি আমারদের ইহ-জীবনের নেতা, আমারদের অমর আত্মার চিরসঙ্গী। সে সঙ্গ ছাড়িয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদে দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম কলঙ্কিত করিলাম। তিনি যে আত্মার উন্নতি সাধনের গুরুভার আমারদের মস্তকের উপর অর্পণ করিয়াছেন, আজ সাশ্রু নয়নে কম্পিত কলেবরে নিজ নিজ জীবন পুস্তক উৎঘাটনে আপনার হীনতা ও মলিনতা অনুভব করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া যাইতেছি। অনন্ত আকাশ যাঁর গুরুভার ধারণ করিতে পারে না, এই সমাজ মন্দিরে তাঁহার উজ্জ্বল-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সকলে হৃদয়ের প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করিয়া দাও, কৃত অপ-

রাধের জন্য অনুতাপের সহিত তাঁহার নিকট যোড়করে প্রার্থনা কর, দৈববলে বলী হইবার জন্য তাঁহার দেবপ্রসাদ ভিক্ষা কর, তাঁহার অভয় হস্ত দেখিয়া নির্ভয় হও।

আজ আমারদের সাম্বৎসরিক মহোৎসব। আজ আনন্দের তরঙ্গ এখানে প্রবাহিত হইতেছে। মর্ত্ত্যের নীচ কামনা আমারদের মন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা বন্ধুবান্ধব সহ সম্মিলিত হইয়া বিষয়ের উপরিতন স্তরে মুক্ত বায়ুতে সঞ্চরণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি সন্দর্শনে বিমল আনন্দলাভের অধিকারী হইয়াছি। আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্বেত্তা জ্যোতিষ্কমণ্ডল সন্দর্শন করিবার সময় যেমন উচ্চমঞ্চে আরোহণ করেন, তেমনি আমরা আজ আকাশের অতীত দেবদেব মহাদেবের পূর্ণ মহিমা সন্দর্শন করিবার জন্য বিষয় রাজ্যের সীমার বহির্দেশে—পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়াছি। ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর ভাবের পূতিগন্ধ আমাদের মস্তককে বিকৃত করিতে পারিতেছে না।

হে পরমাত্মন্! এই উৎসব-আমোদের দিবসে তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব। তোমার অনিমিষ চক্ষু আমারদের উপরে দিনযামিনী সমভাবে নিপতিত রহিয়াছে। আমারদের জীবন তোমার করুণার প্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমারদের কি সাধ্য যে তোমার অতুলন মুখচ্ছবি সকল সময়ে সন্দর্শন করিয়া সাংসারিক অভ্যুদয় ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। আমরা মর্ত্ত্যের কীট হইয়া সংসার জলধির পরপারে তোমার অক্ষয় অনন্ত ব্রহ্মধাম দেখিতে পাইব এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। বিষয় চিন্তা ক্ষণকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। তুমি এই অবকাশে আমারদের শূন্য হৃদয়কে অধিকার কর। যেখানে শত শত সূর্য্যের বিমল কিরণে দিক্‌বিদিক্ জ্যোতিষ্মান রহিয়াছে, যেখানে রাত্রি নাই, জরা মৃত্যুর আধিপত্য নাই, কেবলই উৎসবানন্দ প্রেমানন্দের মনোহর তান অনবরত উত্থিত হইতেছে, যেখানে দেবতাদিগের স্তুতিগানে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেখানে তোমার প্রেমের কুসুম চারিদিকে একে একে বিকসিত হইতেছে, যেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান রহিয়াছে, যেখানে সকল সাধকে পরিবৃত হইয়া তোমার যশঘোষণা করিতেছে, যেখানে তোমার আলোকে সাধকের হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তুমি সেই ছবি একবার দূর হইতে আমারদিগের নয়নের সম্মুখে ধারণ কর, তোমার প্রেমের প্রেমিক কর, যে আমরা সংসারকে একেবারে ভুলিয়া যাই, তোমার প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উদাসীনের ন্যায় নশ্বর সুখের ঘোর পিপাসা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করি। "আবিরাবীর্ম্মএধি" তুমি আমারদের সম্মুখে চির বিরাজিত থাক, যেন আর পথহারা হইয়া তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। তুমি যে অকৃত অমৃত পুরুষ, আমরা যে অমরত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী, আমরা যেন তাহা সম্যক অবধারণ করিয়া তোমার পূজার্চ্চনায় অমর আত্মার পাথেয় সম্যকরূপে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এ আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্যাখ্যানমঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান।

(বিগত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকার ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

মোরা মূঢ় মতি, বিষয়ের প্রতি
অমৃত আশয়ে ধাই।
আশায় বিফল, শুধু হলাহল,
লংঞ্ছনা কতই পাই॥
অমৃত সাগর, হয়েন ঈশ্বর,
জীবনের আস্বাদন।
তিনি শান্তি ধাম, তিনিই আরাম,
দুখে সুখ তিনি হ'ন॥
করুণা তাঁহার, গম্ভীর অপার,
অনুক্ষণ হৃদি স্মর।
তাঁর পথে যাও, তাঁর নাম গাও,
তাঁহার বচন ধর॥

বিষয় বাসনা ছাড়ি, তাঁহারে ভজিব,
তাঁর প্রেমেতে গলিব।
তাঁর পানে চাহি, মোহ পাশ পাশরিব,
তাঁরে পরাণ সঁপিব॥
এই চান তিনি—হ'ব তাঁহারি বলিয়া—
দিতেছেন দিব্য জ্ঞান।
মলিন কামনা হ'তে শোধিছেন হিয়া,
দেন অমৃত সোপান॥
বিগত জীবন লাগি না করিহ ভয়,
ডাক তাঁরে সকাতরে।
দুঃখের প্রেমের অশ্রু হেরি দয়াময়,
কাছে ডাকেন সাদরে॥
তাঁহার সহিত প্রেমে জীবন যাপিতে—
তাঁরে করি দরশন।
যত করিয়াছ আশ, তাঁহারে লভিতে,
সব হইবে পূরণ॥
যাঁর বলে চলিতেছে সকল সংসার,
তাঁরে চাও ধর্ম্ম বল।
প্রেয় পরিহরি কর তাঁর পথ সার,
হবে জীবন সফল॥
তাঁর প্রেম যদি আসে তোমার হৃদয়ে—
সেই প্রেমের লক্ষণ।
পুরাতন চলি যা'বে মলিনতা লয়ে
হবে নূতন জীবন॥
ভাতিলে সে প্রেম-সূর্য্য হৃদয়-গগনে—
কি বা আনন্দ অপার।
ক্ষুদ্রভাব খদ্যোতিকা পলায় সঘনে,
দূরে যায় অন্ধকার॥
হৃদয়-কমল ফুটে সে সূর্য্য কিরণে।
গন্ধ তাঁরে দান করে।
প্রাণ-পাখী গায় তবে প্রেমানন্দ মনে।
তাঁর বায়ুতে বিহরে॥
স্বর্গীয় সে জ্যোতিঃ হৃদি হইলে নির্ব্বাণ,
ঘেরে অজ্ঞান নিশায়।
রিপু অবসর পেয়ে হয় তেজীয়ান্,
ঘোর বিপদ ঘটায়॥
আপনার নাম—তবে আপনার মান,
কিসে হইবে বিস্তার।
বাসনা পুরাতে হয় আকুল পরাণ,
তাহা বাড়ে অনিবার॥
হেন দশা নাহি হো'ক—ভুলিব তা হ'লে,
কেন জীবন ধারণ।
দেব-ভাব হৃদয়ের সব যা'বে চলে,
হবে অধোতে পতন॥
না রহিবে তাঁর দ্বারে কাঁদিয়া প্রার্থনা,
যদি তারেন পামরে।
যদি পাপ রাশি তিনি করেন মার্জ্জনা,
নিজ কৃপা গুণ তরে॥
যাবে—সেই ঊর্দ্ধ দৃষ্টি সে নয়ন পানে,
তাঁর সহবাস-আশ।
যাহা পেলে স্বর্গ ভোগ হয় এই খানে,
যার মিটেনা পিয়াস॥
ঈশ্বর করুণ তাঁর প্রেমেতে মজিয়া,
যেন ভুলি আপনারে।
তাঁহার চরণে ভক্তি একান্তে রাখিয়া,
যেন চলি এ সংসারে॥

প্রচারিতে তাঁর নাম—পূজা—বিশ্বময়।
তাঁর ভাবে গলে যা'তে সবার হৃদয় ॥
তাঁর কার্য্য—তাঁর সেবা—করে জগজন।
তাঁরে পায় লোকে ; ইথে করহ যতন ॥

প্রার্থনা।

হে নাথ! অজ্ঞান অন্ধ আমরা সবাই।
তোমার সত্যের পথ দেখিতে না পাই ॥
কৃপা করি তুলে লও প্রেয় পথ হ'তে।
লয়ে যাও তব শুভ অমৃতের পথে ॥
কেমনে তোমার নাম করিব প্রচার।
কেমনে তোমার ধর্ম্ম করিব বিস্তার ॥
দুর্ব্বল—অধীন—লই তোমার শরণ।
করুণা কটাক্ষ তুমি কর বিতরণ ॥
দুর্ব্বলে করহ বলী, সভয়ে অভয়।
তোমার কৃপায় নাথ! কিবা নাহি হয় ॥
ইতি চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

পত্র।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এখন হইতেই ১১ মাঘের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসবের প্রথম দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নামে এবং দ্বিতীয় দিনে ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসব করা হয়। ১৮০২ শকের ১৮ পৌষ তারিখে উৎসবের এই নিয়ম ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মমন্দিরে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি তৎকালে বেদী হইতে যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। "আমাদিগের ধর্ম্মপিতা পরে আসিলেন। তিনি জীবিত আছেন। পিতামহকে বিস্মরণ হওয়া যেমন অসম্ভব পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তেমনি অসম্ভব। তাঁহার ঋষি ভাব, যোগ ভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবের নূতন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলাম। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক মণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। রামমোহন রায়ের সময়ে মণ্ডলী গঠিত হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের অবশিষ্টাংশ যিনি পরে আসিলেন তিনি করিলেন। * * ইনি বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ঋষি আত্মা। এই পবিত্র ঋষি আত্মা—দেবেন্দ্রনাথের আত্মা বঙ্গবাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল। যখন ইনি স্বর্গ হইতে আইসেন তখন ঈশ্বর ইহাঁকে দীক্ষিত করিয়া দেন। ইনি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়া দুই এক বৎসর নয়, কিন্তু যৌবন হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইহাঁর সমস্ত শরীর মন উদ্যম তোমার আমার ন্যায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মপিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ।"

কেশব বাবু এখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন কিন্তু তিনি যে মণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন সেই মণ্ডলীর ভগবদ্ভক্ত ও সাধুভক্ত মহাত্মারা পূর্ব্বধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। গত ১৯ পৌষ তারিখে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি চারি জন ভক্ত ১১ই মাঘের শুভ উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ত্তমান আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে লিখিত পত্রের সহিত তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

একান্ত বন্দনীয় ধর্ম্মপিতা
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণকমলে—

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীচরণে নিবেদনমিদম্,

গত কল্য হইতে ঊনষষ্টিতম মাঘোৎসবের প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই শুভ উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নববিধান সমাজ
৭৮নং অপরসর্কুলার রোড
১৯ পৌষ ১৮১০ শক।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৭ সংখ্যা

১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ঊনষষ্টি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ বুধবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

প্রাতঃকাল।

আমাদিগের শুভ ব্রহ্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত বহিঃপ্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপের নিম্নে ব্রহ্মোপাসনা হয়। দেশ বিদেশ লইয়া লোকসংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল। যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারিত হইতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোৎসবের জন্য লোকের উৎসাহ ও অনুরাগ বাড়িতেছে। এই উৎসবে কোন রূপ বাহ্য আড়ম্বর নাই, তথাচ জনতা, ইহাতে বোধ হয় এক সময় এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশের সকল জাতি ও সকল বর্ণের একমাত্র আশ্রয় হইবে। ফলত প্রাতের লোকসমাগম অতিশয় প্রীতিজনক হইয়াছিল, এই উপলক্ষে বহুদিনের পর অনেক সাধুর দর্শন পাইয়াছিলাম। একমাত্র ব্রহ্ম আমাদিগের উপাস্য। তাঁহার নামেই সকলে আসিয়াছিলেন। তিনিই এই উৎসবের অধিষ্ঠাতা, সুতরাং বাহ্য সৌন্দর্য্য না থাকিলেও ইহাতে চমৎকৃত হইবার পূর্ণ আয়োজন ছিল। যিনি একবার এই উৎসব ভোগ করিয়াছেন তিনি জীবদ্দশায় কিছুতেই ইহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। এই জন্য ব্রহ্মোৎসবে এরূপ জনতা। বেলা ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। সভাস্থল নিবাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় স্থির। ব্রহ্মজ্ঞেরা ব্রহ্মযোগে যুক্ত। সমবেত গায়কদিগের মধুর কণ্ঠ গগনাভোগ ভেদ করিয়া অনন্তে মিলিতেছে; সমস্ত সাধু হৃদয় সঙ্গীত সুধায় উন্মত্ত। ফলত প্রাতঃকালের উপাসনা জীবন্তভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। উপাসনার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই উপদেশ পাঠ করেন।

আবার সম্বৎসর পরে ১১ মাঘের প্রাতঃসূর্য্য একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মগণকে উদ্বোধিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মি যেমন শতধা বিকীর্ণ হইয়া সৌর জগতের প্রত্যেক পদার্থকে রঞ্জিত করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মের হৃদয়ে

ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মুখ-শ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। ভক্তের প্রাণে আজ স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, মঙ্গলের প্রতিদান—কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস হৃদয়ের প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া ছুটিতে চায়, কে তাহা নিবারণ করিবে! আত্মার আত্মজ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া, মনের পবিত্রতা পরিশুদ্ধ হইয়া এবং হৃদয়ের প্রেম প্রশস্ত হইয়া আজ একস্রোতে সেই ব্রহ্মপদের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। ভক্তের চক্ষু আজ যে দিকে ফিরিতেছে সেইদিকেই কি এক অপূর্ব্ব শোভা, মঙ্গলের নিদর্শন এবং গূঢ় গভীর জ্ঞান প্রেমের আভাস নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হইতেছে। ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশ, নিম্নে তরু নদী, ভূধর প্রান্তর সকলি আজ মধুময়, অমৃতময়। ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বরের "আনন্দরূপমমৃতং" অদ্যকার বিশেষ আরাধ্য বস্তু। আজ সেই আনন্দ-সাগরে অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া, আজ সেই আনন্দ-সাগরের, অমৃত-সাগরের আনন্দামৃতবারি পান করিয়া এরূপ সুশীতল হইতে হইবে যাহাতে আমরা চিরদিন আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারি; সংসারের কোন শোক, কোন তাপ যাহাতে আর আমাদিগের আত্মাকে বিক্ষোভিত করিতে না পারে। পাপ করিয়া সংশোধিত হইবার জন্য আমরা যাঁহার রুদ্র মুখ অবলোকন করি, পুণ্যে উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য যাঁহার প্রসন্ন মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিতে পাই, অদ্যকার এই মাঘোৎসবের পবিত্র দিবসে তাঁহারই "আনন্দরূপমমৃতং" সর্ব্বত্র সন্দর্শন করিতেছি। তিনি আনন্দরূপে অমৃত রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যেমন এই উৎসবের মূলে প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন, আবার আমাদের উপভোগের জন্য আমাদের হৃদয়েও আনন্দ-ধারা, অমৃতধারা প্রবাহিত করিতেছেন। এই উৎসব দিনে এই অমৃতানন্দ হইতে যে জ্ঞানানন্দ আমরা লাভ করিতেছি তাহা আমাদের অনন্তকালের সম্বল—তাহা আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের নিঃসংশয় নির্ভর। ইহা হইতে এই জ্ঞান সহজেই আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে যে, যে দিন এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই বিবিধ বিচিত্র বস্তুজাত কিছুই ছিল না, কোথাও এক বিন্দু পরমাণুও ছিল না, তখনকার সেই অসীম শূন্য পরিপূর্ণ করিয়া যে এক মহাপ্রাণ, যে এক আদিকারণ জাগ্রৎ ছিলেন তাহা আনন্দেরই রূপ। আর সেই আনন্দস্বরূপ আদিকারণে স্বধা নাম্নী প্রকাশোন্মুখী যে এক মহা শক্তি নিহিত ছিল যাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল ও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক অব্যক্ত ছিল, তাহা আনন্দই অব্যক্ত ছিল। সেই আনন্দের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা হইতে এই যে বিশ্বব্যাপার উৎপাদিত হইতেছে ইহাও এই আনন্দের আবহ। গুহাস্থ প্রস্রবণ হইতে নদী সকল প্রবাহিত হইয়া যে সমুদ্রের মহা আয়তন পূর্ণ করিতেছে তাহা সলিলই। প্রস্রবণের ঝর ঝর নিনাদ, বেগবতী নদীর কল কল শব্দ এবং মহাসাগরের গভীর নির্ঘোষ যেমন নিনাদই, সেইরূপ সেই আদি কারণ প্রাণ স্বরূপ মহেশ্বরের অব্যক্ত মহিমা তখনকার সেই আত্মজ্যোতি, ব্যক্ত মহিমা বহির্জ্যোতি এই গ্রহনক্ষত্রখচিত বিশাল বিশ্ব এবং পারকালিক অনন্ত মঙ্গলের প্রতি আমাদের আত্মার এই যে নিঃসংশয় বিশ্বাস এ সকলি সেই আনন্দই। তাই যখন তপঃপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত পুরুষ আপনার আত্মার বিমল দর্পণে পরমাত্মার পরম সত্য জ্যোতি নিভৃতে সন্দর্শন করিতে থাকেন তখন তাঁ-

হার মনে এত আনন্দ উৎসারিত হয়। তাই যখন মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গের সঙ্গীত এক প্রান্তরে বহির্গত হইয়া অন্যপ্রান্তরে অবসান পাইতে ধাবিত হয়, তখন পথিকের মনে এত আনন্দের উদয় হয়। তাই যখন কোমল লাবণ্যবতী লতিকার উপরে সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন উদ্যান এত সুন্দর হইয়া উঠে। তাই যখন অঙ্কপূর্ণকারী সরল শিশুর মুখে মধুর হাস্য-রেখা অঙ্কিত হয় তখন জননীর হৃদয়ে এত আশা আনন্দের সঞ্চার হয়। তাই যখন অন্ধকার আকাশে চন্দ্র তারকার উদয় হয় তখন যামিনী এত মধুময় হয়, সূর্য্য উদিত হইলে দিবস এত শুভ্র হয়। তাই পরলোক-গমনোন্মুখ তাপস যখন আপনার অনন্ত জীবনের পথ পরিমুক্ত ও পরিশোভিত দেখেন তখন তাঁহার আত্মার এত শান্তি এত তৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়। আনন্দেরই এই সকল প্রতিরূপ। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই তপঃপরিশুদ্ধ প্রাচীন ঋষি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকলি একটি আনন্দের ধারা। আদিতে আনন্দ, বর্ত্তমানে আনন্দ এবং ভবিষ্যতে আনন্দ। কারণে আনন্দ, কার্য্যে আনন্দ এবং অবসানে আনন্দ। যিনি নিখিল জগতের একমাত্র সেব্য কূটস্থ পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ ইহ জীবনে বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতে এবং কোথাও হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না। তিনি সেই আনন্দ রস অহরহ পান করিয়া আত্মতৃপ্ত হয়েন। যদি সেই আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম এই আকাশে বিরাজিত না থাকিতেন তবে এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ মৃত্যুর গভীর অন্ধকারময় ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিত। সেই আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মই এই সকলের পরম গতি, ইনিই সকলের পরম সম্পদ, ইনিই সকলের পরম লোক, ইনিই সকলের পরমানন্দ। এই পরমানন্দ স্বরূপে যিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন, সকল নির্ভরের সহিত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ সুখের জন্য প্রার্থনা করিতে হয় না। তিনি শাশ্বত আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন। তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয়গ্রন্থি সমুদায় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

আমরা এই মর্ত্ত্যের কীট হইয়া এবং জন্ম জরা মৃত্যুর সতত পরিবর্ত্তনশীল চক্রে বিঘূর্ণিত রহিয়া এই যে সংশয়রহিত পরম অমৃতের আস্বাদন প্রাপ্ত হইতেছি ইহা সকল বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবকেই স্মরণ করিয়া দেয়। ব্রাহ্মেরই এই সৌভাগ্য যে তিনি জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতার বলে আনন্দময় পরব্রহ্মের সহবাসের যোগ্য হইয়াছেন। মধুমক্ষিকা যেমন আপনার সূক্ষ্ম চক্ষুর বলেই পুষ্পের গুপ্ত মধু ভাণ্ডার হইতে মধুপান করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার বলেই সেই সত্যের পরমনিধান অমৃতভাণ্ডার হইতে অমৃতানন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। এক সম্প্রদায় মনুষ্য আছে, ব্রহ্মলাভের প্রতি যাহাদের কিছুমাত্র যত্ন ও শ্রদ্ধা দেখা যায় না। তাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিল না। মৃত্যুর পরে তাহাদের জ্ঞানময় আনন্দময় লোক হইতে বহুদূরে থাকিতে

হইবে। মৃত্যুর পূর্ব্বেও অজ্ঞানমেঘে আবৃত থাকিয়া তাহাদিগকে আত্মগ্লানির শিলাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে। যে লোকে আত্মার যে অনুসারে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত হয়, সেই অনুসারে সেই লোকে তাহার ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হয়। সত্য-পন্থানুগামী ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মেরই ব্রহ্মানন্দ লাভের অধিকার। তিনি কল্যাণ হইতে কল্যাণতর এবং আনন্দ হইতে আনন্দতর লোকে উত্থান করেন। ব্রাহ্মের এই অধিকার এই জন্য যে তিনি এখানে থাকিয়াই আনন্দ স্বরূপ অমৃত স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্ম ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, হে সমাগত ব্রাহ্মগণ! আইস, আজ আমরা এই ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করি। আর সেই ঋষির সহিত এক স্বরে সেই বাক্য প্রতিধ্বনিত করি যে ঋষি জাহ্নবীতীরে বা হিমাচলের পাদমূলে দণ্ডায়মান হইয়া একদিন আকাশপূর্ণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণন্তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় "

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল তোমরা শ্রবণ কর। আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করেন।

সম্বৎসর পরে আবার আমরা ভ্রাতায় ভ্রাতায় পিতাপুত্রে বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া দেবারাধ্য পরম পিতার সুপবিত্র কল্যাণ ছায়ায় সমুপবিষ্ট হইয়াছি। সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে আজ আমরা আমাদের সকল উৎসবের অধিদেবতা—সকল সম্পদের মূলাধার—সকল বিপদের কাণ্ডারী পরম প্রভু পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া এই আনন্দে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছি যে, আজ আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার অনুপম আনন্দরসে, তাঁহার দেব-দুর্লভ প্রেম-সুধায়, তাঁহার অমোঘ মঙ্গল আশীর্ব্বাদে মনের সাধে আমাদের হৃদয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিব। কাঁহার ইচ্ছায় এখানে আমরা আজ সম্মিলিত হইয়াছি? যাঁহার ইচ্ছায় নৈশ নভোমণ্ডলে তারকা-জ্যোতি সম্মিলিত হয়, সরোবরে বিকসিত পঙ্কজ-শ্রেণী সম্মিলিত হয়, বনবিপিনে পুষ্পিত তরুরাজি সম্মিলিত হয়, তাঁহারই ইচ্ছায় অদ্য এখানে আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। পিতা মাতা যেরূপ দৃষ্টিতে সন্তান-মণ্ডলীর প্রতি নিরীক্ষণ করেন, প্রাণ-সখা যেরূপ দৃষ্টিতে প্রাণ-সখার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, গুরু যেরূপ দৃষ্টিতে প্রিয় শিষ্যের অর্দ্ধস্ফুট জ্ঞানালোকের প্রতি নিরীক্ষণ করেন সেইরূপ ইচ্ছা-পূর্ণ মঙ্গল দৃষ্টিতে ঈশ্বর সর্ব্বজগৎকে এবং আমাদের প্রত্যেককে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্ববিজয়ী মঙ্গল আশীর্ব্বাদ সূর্য্য কিরণের ন্যায় সর্ব্ব জগতে অনাবৃত রহিয়াছে; এবং ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মার অভ্যন্তরে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে; তাই আমরা আপনার আপনার অজ্ঞাতসারেও—এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধেও—অনেক সময়ে এরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়ি যাহাতে পরিণামে সর্ব্বজগতের মঙ্গল

হয়। যাঁহার মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ আমাদের সুষুপ্তির অভ্যন্তরেও আমাদের অজ্ঞাতসারে অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে, য এষ সুপ্তেষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ তাঁহারই মঙ্গল আশীর্ব্বাদে আমরা এখানে সমাগত হইয়া কৃত-পুণ্য হইয়াছি। মঙ্গল দুই নহে—মঙ্গল এক। সেই—এক মঙ্গলের সঙ্গে সমস্ত জগতের সমস্ত ব্যক্তির সমস্ত মঙ্গল অনির্ব্বচনীয় প্রেমসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে; সে মঙ্গল কি? না ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা। আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার আপনার যত না মঙ্গল ইচ্ছা, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা তাহা হইতেও অপরিসীম অধিক; কেন না আমরা তাঁহারই পুত্র কন্যা। অতএব তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিও না—সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত, কৃতজ্ঞতার সহিত, শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত, সেই ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছাটি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে আত্মসাৎ করিয়া তদনুসারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর এবং অনায়াসে অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হও, "স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" তোমাদের ইহকালে পরকালে মঙ্গল হউক্।

আমরা আজ আপনার আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া অদ্য যে এখানে সবান্ধবে সম্মিলিত হইয়াছি—আমাদের এ ইচ্ছা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি; কেননা, গোড়াতে ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল ইচ্ছা না করিলে, আমরা আপনারাও আমাদের মঙ্গল ইচ্ছা করিতাম না—করিতে পারিতামও না। এই তত্ত্বটি না বুঝিয়া বর্ত্তমান কালের কৃতবিদ্য লোকেরাও ফরাসীস দেশের নূতন-সৃষ্ট এই একটা কথায় নির্ব্বিবাদে ঘাড় পাতিয়া দেন যে, আপনার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি একেবারেই বিমুখ হইয়া শুদ্ধ কেবল পরের জন্য কার্য্য করাই ধর্ম্ম-কার্য্য; অন্ধ প্রকৃতি যেমন শুদ্ধ কেবল পরের জন্য কার্য্য করে—সেইরূপ পরার্থ-পরতাই ধর্ম্ম; যেন আপনার মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করিলে সে কার্য্যের কোন পারমার্থিক মূল্য নাই। ইহাঁদের এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আপনার স্ত্রী পুত্র ভ্রাতাভগিনীর মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিলে তাহারও কোন পারমার্থিক মূল্য নাই—কেননা আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার আপনারই সামিল; তবে কি? না আমার আপনার সহিত মূলেই যাহার কোন সম্পর্ক নাই—নিতান্তই যে আমার পর—তাহার মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিলে তবেই তাহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে! এ তো কেবল দেখিতেছি—উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে হাত বাড়ানো। যে আপনার মঙ্গল বোঝে না সে অন্যের মঙ্গল কিরূপে বুঝিবে? যে আপনার মঙ্গলের প্রতি অযত্ন করে—সে অন্যের মঙ্গলের প্রতি কিরূপে যত্নবান্ হইবে? যে আপনার পুত্রকে খাওয়া পরা দিতে পারে না, সে কিরূপে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভরণ-পোষণ করিবে? আপনার মঙ্গলকে যদি মঙ্গল বলিয়া বোধ না হয়—তবে পরের মঙ্গলকে কিরূপে মঙ্গল বলিয়া বোধ হইবে? যাঁহারা মনে করেন যে, আপনার মঙ্গলের প্রতি বিমুখ হইয়া পরের মঙ্গল সাধন করাই নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম—তাঁহারা নিঃস্বার্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ এখনো পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। "নিঃস্বার্থ"—শব্দ একটি বই নয়, কিন্তু তাহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে; নিঃস্বার্থ-শব্দের এক অর্থ পরার্থ—আর এক অর্থ পরমার্থ; পরার্থ কি? না আপনাকে আদবেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে না ধরিয়া

—আপনাকে জগৎ হইতে একেবারেই ছাঁটিয়া ফেলিয়া—পরের জন্য কার্য্য করা ; ইহারই নাম পরার্থ। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রের মতানুসারে পরার্থ-পরতা অন্ধ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম ; অন্ধ প্রকৃতি আপনার জন্য কোন কার্য্যই করে না—যাহা কিছু করে সকলই অন্যের জন্য। পরমার্থ তবে কি ? সংক্ষেপে বলিতে হইলে সর্ব্বজগতের মঙ্গল সাধন করা, ইহাই পরমার্থ। কিন্তু ইহার অর্থ ভাঙিয়া বলিতে হইলে এইরূপে তাহার টীকা করা আবশ্যক যে, সর্ব্বজগতের মধ্যে তুমিও আছ—আমিও আছি—সকলেই আমরা আছি। সর্ব্বজগতের মঙ্গল সাধন করা যদি আমার কর্ত্তব্য হয়, তবে আমার আপনার মঙ্গল সাধন করাও আমার কর্ত্তব্য ; কেননা আমি সর্ব্বজগৎ ছাড়া কোন কিছু নহি—আমিও সর্ব্বজগতের অন্তর্ভূত একজন ব্যক্তি। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, অন্ধ প্রকৃতির ন্যায় আপনার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি বিমুখ হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে তৎপর হওয়াই পরার্থ-পরতা ; আর, আপনাকে শুদ্ধ ধরিয়া জগতের মঙ্গল সাধনে তৎপর হওয়াই পরমার্থ-পরতা। স্বার্থের সঙ্গে পরার্থ এবং পরমার্থ এ দুয়ের কাহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখিলেই, পরার্থ এবং পরমার্থের মধ্যে প্রভেদ যে, কি, তাহা কাহারো নিকটে অব্যক্ত থাকিবে না। অতীব সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় সম্বন্ধ ; কিন্তু স্বার্থ এবং পরমার্থের মধ্যে এক দুই সম্বন্ধ ; সে কেমন ? না যদি বলি যে, প্রথম মুদ্রাটি গ্রহণ করিও না দ্বিতীয় মুদ্রাটি গ্রহণ কর, তবে প্রথম মুদ্রাটি বাদ পড়িয়া যায়; কিন্তু যদি বলি যে, একটি মুদ্রা গ্রহণ করিও না—দুইটি মুদ্রা গ্রহণ কর, তবে দুইটির কোনটিই বাদ পড়ে না। এ যেমন—তেমনি যদি বলি যে, স্বার্থের উদ্দেশে কার্য্য করিও না—পরার্থের উদ্দেশেই কার্য্য কর, তবে স্বার্থ একেবারেই বাদ পড়িয়া যায় ; কিন্তু যদি বলি যে, স্বার্থের উদ্দেশে কার্য্য করিও না—পরমার্থের উদ্দেশে কার্য্য কর, তবে স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের কোনটিই বাদ পড়িয়া যায় না ; কেননা স্বার্থ এবং পরার্থ দুইই পরমার্থের অন্তর্ভূত। আমরা তাই বলি যে, "অনেক" যেমন এক হইতে ভিন্ন, নিঃস্বার্থ তেমনি স্বার্থ হইতে ভিন্ন ; কিন্তু অনেক বলিতে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বুঝায় না—দুই তিন চা'র পাঁচই বুঝায় ; তেমনি নিঃস্বার্থ বলিতে তোমার স্বার্থ, আমার স্বার্থ, সকলেরই স্বার্থ, একসঙ্গে বুঝায়—পরমার্থ বুঝায়; আমার স্বার্থ ছাড়িয়া তোমার স্বার্থ বুঝায় না—পরার্থ বুঝায় না ; কেননা, প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয়ই যেমন দুয়ের অন্তর্ভূত, স্বার্থ এবং পরার্থ উভয়ই তেমনি পরমার্থের অন্তর্ভূত। অনেককে পাইলে যেমন এককেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়, নিঃস্বার্থকে পাইলে তেমনি স্বার্থকেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়। কেবল মাত্র প্রথমকেও দুই বলা যাইতে পারে না—কেবল-মাত্র দ্বিতীয়কেও দুই বলা যাইতে পারে না ; তেমনি, কেবল মাত্র স্বার্থকেও পরমার্থ বলা যাইতে পারে না—কেবল-মাত্র পরার্থকেও পরমার্থ বলা যাইতে পারে না ; তবে কি ? না প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয়ের একীভূত ভাবই দুই ; স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের একীভূত ভাবই পরমার্থ।

পরমাত্মার ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত হইয়া তোমার স্বার্থ যখন আমার স্বার্থ

হয় এবং আমার স্বার্থ যখন তোমার স্বার্থ হয়; অথবা যাহা একই কথা—পরমাত্মার ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছা যখন তোমার আমার এবং সকলেরই স্বার্থ হয়; তখনই স্বার্থ এবং পরার্থ দুইই একীভূত হইয়া পরমার্থে পরিণত হয়। পরমার্থকে পাইলে স্বার্থের কোন অভাবই থাকে না। পরমার্থ কি? না ঈশ্বরের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ। আমাদের প্রত্যেকেরই আপনার আপনার মঙ্গল ইচ্ছা ঈশ্বরেরই মঙ্গল ইচ্ছার অন্তর্ভূত; আমাদের প্রত্যেকেরই প্রকৃত স্বার্থ সেই পরমার্থেরই অন্তর্ভূত। তাই একজন লোক-প্রসিদ্ধ ভগবদ্‌ভক্ত সাধু মহাত্মা বলিয়াছেন—"প্রথমে ঈশ্বরের অমৃত নিকেতনের পথ অনুসরণ কর, আর আর যাহা কিছু তোমার প্রয়োজন সমস্তই তোমাতে অনুসংযোজিত হইবে।"

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শুদ্ধ কেবল পরের জন্যই কার্য্য করিব এরূপ প্রতিজ্ঞার গোড়াতেই দোষ। কেননা, পরমপিতা পরমেশ্বর যখন সকল আত্মারই অন্তরাত্মা, তখন কেহ কাহারো পর নহে—সকলেই সকলের আপনার। পরই যখন নাই, তখন পরের জন্য কার্য্য করা কিরূপ? শিরই যা'র নাই, তা'র আবার শিরঃপীড়া কিরূপ? লোকে যখন স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল সাধন করে, তখন কেহ আর এমন মনে করে না যে, স্ত্রী পুত্রের মঙ্গল আমার আপনার মঙ্গল নহে—তাহা শুদ্ধ কেবল পরেরই মঙ্গল। তেমনি ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষ যখন কোন অজ্ঞাত অপরিচিত অতিথির পাতে অন্ন পরিবেশন করেন, তখন তিনি এরূপ মনে করেন না যে, সে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য শুধু কেবল পরেরই মঙ্গল—তাহা তাঁহার আপনার মঙ্গল নহে। দক্ষিণ হস্তও বাম হস্তের পর নহে—বাম হস্তও দক্ষিণ হস্তের পর নহে, কেননা উভয়েই একই হৃদয়ের দুই পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে; তেমনি, তুমিও আমার পর নহ—আমিও তোমার পর নহি—কেননা উভয়েই আমরা একই পরমাত্মা হইতে আসিয়াছি। শাস্ত্রে আছে যে, শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে—পর ভাবিয়া যাহাকে যাহা দান করা যায়, সেরূপ দান'কে কিছু আর শ্রদ্ধার দান বলা যাইতে পারে না; আপনার ভাবিয়া যাহাকে যাহা দান করা যায় তাহাই শ্রদ্ধার দান। পরমেশ্বর সর্ব্বজগতের অধীশ্বর অথচ তিনি ভক্তজনের আপনার ঈশ্বর;—ভক্তজনের নিকটে তিনি অজ্ঞাত অপরিচিত পর নহেন—প্রত্যুত তিনি যেমন তাঁহার আপনার এমন আপনার আর কেহই নহে—

"স এষ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

ঈশ্বর যাঁহার আপনার সকলই তাঁহার আপনার; এই জন্য তিনি যখন জগতের মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করেন, তখন তিনি মনে করেন যে, আমি আমার আপনারই মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছি; যখন তিনি আপনার মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করেন তখন তিনি মনে করেন যে, আমি জগতের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছি; কেননা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরের প্রেম-সূত্রে সকল মঙ্গলেরই সঙ্গে সকল মঙ্গল অবিচ্ছেদে গ্রথিত রহিয়াছে; কাজে কাজেই পরের মঙ্গলও আপনার মঙ্গল, আপনার মঙ্গলও পরের মঙ্গল। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যিনি পরের জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেন, তিনি পরেরও মঙ্গল সাধন করেন আপনারও মঙ্গল সাধন করেন; সকলকে সুখী করিবার জন্য যিনি আপনার সুখ

অগ্রাহ্য করেন, তিনি ঈশ্বরের সহবাস-লাভে স্বর্গাতীত স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পা'ন তাঁহার আবার অমঙ্গল কোথায়? অতএব ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাকে আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তরে আত্মসাৎ করিয়া তদনুসারে আপনার এবং অন্যের মঙ্গল সাধন করা এবং ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া কোন প্রকার কার্য্য না করা—ইহাই এক মাত্র ধর্ম্ম।

ফরাসীস দেশীয় আর একটা অলীক মৃগতৃষ্ণা আমাদের দেশের আধুনিক কৃত-বিদ্য সমাজে বিষম এক মোহিনী মায়া বিস্তার করিতেছে; সেটা এই যে সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে প্রীতি করিলে তাহাতেই প্রীতির যৎপরোনাস্তি চরিতার্থতা হইতে পারে—ঈশ্বর-প্রীতি কেবল একটা বা-ড়া'র ভাগ। ইহাঁদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কোথায় গেলে আমি সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীর দেখা পাইতে পারি—সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলী থাকে কোথায়? সকলেই তো আমরা আপনার আপনার পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন সহচর অনুচর বন্ধু-বান্ধব, ইহাঁদিগকেই চক্ষে প্রত্যক্ষ করি, আর, ভাল বাসিবার মধ্যে তাঁহাদিগকেই ভাল বাসি। সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে কে কবে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি? যাহাকে আমি কোন জন্মে প্রত্যক্ষে উপ-লব্ধি করি নাই, তাহাকে আমি কিরূপে ভাল বাসিব? প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য-মণ্ডলী বলিতে বাহিরের দৃশ্যমান মনুষ্য-মণ্ডলী ছাড়া আর একটি বিষয় বুঝায়—সেটি কেবল অন্তরে প্রত্যক্ষ করিবার সামগ্রী—কি? না মনুষ্যত্ব। যাহার গুণে মনুষ্য-মাত্রই পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট—তা-হাই মনুষ্যত্ব, সুতরাং তাহা মনুষ্য মাত্রে-তেই আছে; তবে—কোন মনুষ্যে তাহার বীজ মাটি-চাপা রহিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার পল্লব গজাইয়া উঠিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার ফুল ফুটিয়াছে; কোন মনুষ্যে তাহার ফল ফলিয়াছে—কিন্তু আছে তাহা সকল মনুষ্যেতেই। প্রত্যেক মনুষ্যেরই অন্তঃকরণের দ্বারে কাণ পাতিলে মানুষ আর পশু দুয়েরই হাঁক ডাক শুনিতে পা-ওয়া যায়; মানুষটির নাম মনুষ্যত্ব—পশু-টির নাম পশুত্ব। পশুটিকে বশীভূত করিলেই মনুষ্যটিকে জাগাইয়া তোলা হয়। অন্তরস্থিত মনুষ্যটিকে ভাল বাসি-লেই সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে ভালবাসা হয়; অন্তরস্থিত মনুষ্যটিকে পর ভাবিয়া অযত্ন করিলেই সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীকে পর ক-রিয়া গড়িয়া তোলা হয়। আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার অন্তরস্থিত সেই যে মনুষ্যত্ব, তাহাই সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীকে হাতাইয়া পাইবার টানা জাল। এ কথা খুবই সত্য যে, আমরা আমাদের চতুর্দ্দিক্স্থ মনুষ্যমণ্ডলীর সংসর্গ হইতে—বিশেষতঃ সাধুসঙ্গ হইতে—মনুষ্যত্ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আপনার আপনার অন্তঃ-করণের অভ্যন্তরে পুঁজি করি—এবং তাহাকেই সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলীর স্থলাভি-ষিক্ত করি; সত্য;—কিন্তু বাহির হইতে মনুষ্যত্ব-রত্ন সংগ্রহ করিতে হইলেও অ-ন্তরে একজন জহরী আবশ্যক। পশু কিছু আর মনুষ্যের মধ্য হইতে তাহার মনুষ্যত্বটি চিনিয়া লইতে পারে না; জ্ঞানই জ্ঞানকে চিনিয়া লইতে পারে, প্রেমই প্রেমকে চিনিয়া লইতে পারে; মনুষ্যের অন্তরে মনুষ্যত্ব আছে বলিয়াই সে বাহিরে মনুষ্যত্ব দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা চিনিয়া লইতে পারে। ঘরের হাতি দিয়া যে-মন বনের হাতি ধরিয়া আনিয়া তা-

হাকে ঘরে পোষ মানাইতে হয়, তেমনি অন্তরের মনুষ্যত্ব দিয়া বাহিরের মনুষ্যত্ব ধরিয়া আনিয়া তাহাকে অন্তরে পোষণ করিতে হয়। অতএব ইহা স্থির-নিশ্চয় যে, মনুষ্য মাত্রেরই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে মনুষ্যত্ব গোকুলে বাড়িতেছে;—এক দিন না এক দিন সাধুসঙ্গের পুণ্য বায়ুতে বা সদ্‌গুরুর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় বা বিশেষ কোন ঘটনার গতিকে ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার চক্ষু ফুটিলেই তাহা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিবে। অতএব "সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীকে ভালবাসা" এই যে একটি কথা —এ কথাটির ভিতরের মর্ম্ম শুদ্ধ কেবল এই যে,আপনার আপনার অন্তরস্থিত মনুষ্যটিকে ভালবাসিয়া তাহার প্রতি যত্ন করা এবং অন্তরস্থিত পশু-গুলাকে তাহার বশে সংস্থাপন করা। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরস্থিত এই যে, মনুষ্যত্ব, ইহার মূল অন্বেষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে, আত্মাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; আত্মাকে ছাড়িয়া মনুষ্যত্ব শুধু কেবল একটা ফাঁকা আওয়াজ। আত্মা হইতেই মনুষ্যোচিত কার্য্য ফুটিয়া বাহির হয়, এবং সেই মনুষ্যোচিত কার্য্যের অভ্যন্তরেই আমরা মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি। আমরা আমাদের আপনার আপনার কৃত মনুষ্যোচিত কার্য্যের মধ্যেও মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি এবং অন্যের কৃত মনুষ্যোচিত কার্য্যের মধ্যেও মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি। সেই যে মনুষ্যোচিত কার্য্য তাহার কর্ত্তা কে—তাহার প্রবর্ত্তক কে? যদি আমরা কাহাকেও এরূপ দেখি যে, সে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বিড়ালের ন্যায় চুরির পন্থায় ফিরিতেছে, তবে সে তাহার কার্য্যের কে প্রবর্ত্তক? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাহার প্রবর্ত্তক আর কেহ নয়—বহির্বস্তুর আকর্ষণ। আর এক ব্যক্তিকে যদি দেখি যে, তিনি ঈশ্বর-প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া তাঁহার অনিষ্টকারীর প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতেছেন, তবে সে তাঁহার কার্য্যের কে প্রবর্ত্তক? বহির্বস্তু নহে কিন্তু আত্মা। অতএব আত্মাই মনুষ্যোচিত কার্য্যের মূল প্রবর্ত্তক—এবং সেই মনুষ্যোচিত কার্য্যের অভ্যন্তরেই আমরা মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করি। তবেই হইতেছে যে, আত্মার প্রবর্ত্তিত মনুষ্যোচিত কার্য্য হইতে ফল যাহা আমরা উপার্জ্জন করি তাহাই মনুষ্যত্ব। আত্মা মূল—মনুষ্যত্ব ফল। এতক্ষণ ধরিয়া আমরা করিলামই বা কি, আর,পাইলামই বা কি? আমরা বিস্তীর্ণ সাগর মন্থন করিয়া এক বিন্দু অমৃত পাইলাম। মনুষ্য-মণ্ডলী মন্থন করিয়া মনুষ্যত্ব পাইলাম—মনুষ্যত্ব মন্থন করিয়া জাগ্রত জীবন্ত আত্মা পাইলাম। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে আত্মা মৃত্তিকাভ্যন্তর-স্থিত বীজের ন্যায় গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু বামন অবতারের যেরূপ গল্প শুনা যায়—শরীরস্থিত সেই যে, আত্মা, তাহার অধিকার-বিস্তার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ছাপাইয়া উঠিয়া অনন্তে গিয়া মিসিয়াছে। এক দিকে আত্মা এবং আর এক দিকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড —আত্মার গুরুভারের নিকটে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নতশির। এইমাত্র বলিলাম যে, আত্মা মনুষ্যোচিত কার্য্যের প্রবর্ত্তক; কিন্তু মনুষ্যোচিত কার্য্য—বলে কাহাকে? কি উদ্দেশে কার্য্য করিলে মনুষ্যোচিত কার্য্য করা হয়? আত্মা মুক্তির ভিখারী—আত্মার লক্ষ কোন প্রকার প্রাচীরের অভ্যন্তরে বদ্ধ থাকিতে পারে না—আত্মার লক্ষ অন্তরের দিকে প্রসারিত। অতএব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ

করিয়া আত্মা যে কোন কার্য্য করে, তাহাই মনুষ্যোচিত কার্য্য; এবং সে কার্য্যের ফল অনন্ত এবং চিরস্থায়ী মঙ্গল। যদি কোন প্রকার ক্ষণস্থায়ী এবং পরিমিত ফল উৎপাদন করা আত্মার চরম লক্ষ্য হয়, তবে সেইটি করিয়া চুকিলেই আত্মার সমস্ত কার্য্য ফুরাইয়া যায়; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিলেই তাহার কার্য্য যাহা তাহা শেষ হইয়া যায়, কাজেই তাহা শুষ্ক হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। আমরা যে কোন গৃহে অবস্থিতি করি না কেন, তাহারই এমন একটি দ্বার খুলিয়া রাখা আবশ্যক যাহার মধ্য দিয়া মুক্ত বায়ু যাতায়াত করিতে পারে; তেমনি, আমরা যে কোন অবস্থায় অবস্থিতি করি না কেন, তাহারই একটি না একটি দ্বার অনন্তের দিকে খুলিয়া রাখা আবশ্যক,—তাহা হইলে ক্ষুদ্র কুটীরের অভ্যন্তরেও স্বর্গের সোপান উন্মুক্ত হইয়া যায়। আমরা যাহা কিছু করি—সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীরই হিত-সাধন করি, আর আমাদের পরিবারবর্গেরই হিত সাধন করি—তাহা যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ করিয়া করি, তবে তাহার ফল তাহাতেই পর্য্যাপ্ত না হইয়া অনন্তে গিয়া পোঁছে। মনুষ্য অমৃতের অধিকারী—এইজন্য অমৃতধনের প্রতি লক্ষ করিয়া কার্য্য করাই মনুষ্যোচিত কার্য্য। অতএব অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মার প্রতি আত্মার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেও—তিনিই অক্ষয় অমৃত ধন। অদ্য এই শুভ মাঘের একাদশ দিবসে সেই অক্ষয় অমৃত ধন ভিন্ন আর কোন কিছুই যেন আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে স্থান না পায়। এই শুভ মুহূর্ত্তে আইস আমরা সরল হৃদয়ে নির্ম্মল চিত্তে এবং তদ্‌গত প্রাণে আমাদের সমস্ত প্রীতিভক্তি সেই পরম প্রভু পরমাত্মার চরণে সমর্পণ করিয়া পাপতাপ দুঃখ শোক জরা মৃত্যুর পরপারে উত্তীর্ণ হই।

হে পরমাত্মন্! দীন হৃদয়ে কৃপাবিন্দু প্রদান কর—ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমসুধা প্রদান কর; আমরা আমাদের হৃদয়ের আসন পাতিয়া দিতেছি—তুমি দেখা দিয়া আমাদের জ্ঞান-নেত্র সফল কর। তোমার দর্শন পাইলে আমরা কি ধন না পাই; তোমার অভয় আনন্দমূর্ত্তি আমাদের মোহ-অন্ধকারের আলোক; তোমার প্রসাদবারি আমাদের মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ; তোমার স্নেহ করুণা আমাদের প্রাণের সম্বল; তোমার প্রেমমুখ-জ্যোতি আমাদের আনন্দের প্রাতঃসূর্য্য। আজ আমরা সকলে মিলিয়া তোমার পূজা করিতেছি—তুমি আমাদিগকে দর্শন দিতেছ—আজ আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি কত তোমার করুণা! তোমার এইরূপ করুণাতেই মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার হয়; এইরূপ করুণাতেই হৃদয়-গ্রন্থি-সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়; এইরূপ করুণাতেই সংসার-সাগরের তুমুল তরঙ্গরাশি প্রশান্ত হইয়া যায়—চতুর্দ্দিকে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। দীন জনের প্রতি করুণা করিয়া তুমি যখন তাহাকে দর্শন দান কর, তখন সে তোমার প্রেমে মৃত হইয়া তোমা ভিন্ন আর কোন কিছুই চাহে না—তোমার মুখজ্যোতিই তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব। চির দিনই যেন এইরূপ তোমার প্রেম-মুখজ্যোতি আমাদের পথের আলোক হয়—এই আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে প্রদান কর, তাহা হইলেই আমাদের সকল দুঃখ—সকল অভাব—দূর হইয়া যায়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহ পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত ও আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। লোকের সমাগম এত হয় যে ঐরূপ প্রকাণ্ড গৃহে তিলার্দ্ধেরও স্থান ছিল না। সুবিখ্যাত বক্তা বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথম একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রতাপ বাবুর বিলক্ষণ জ্ঞান কবিত্ব ও ভাষায় অধিকার আছে। ফলত তিনি স্বীয় বাক্‌শক্তি দ্বারা সভাস্থ সকলেরই যে চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি বারান্তরে তাঁহার বক্তৃতা প্রকাশ করিরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্ত করিব।

প্রতাপ বাবুর বক্তৃতার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি নিম্নোক্তরূপ উদ্বোধন করিলেন।

আজি ব্রহ্মোৎসব। আজি আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে ভজরে ভবতারণে। আজি অন্তর বাহিরে তাঁহাকে দেখ। বাহিরে তাঁহার সেই মঙ্গল-হস্তের রচনার মধ্যে তাঁহাকে দেখ। "আসীন সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর জগৎ-মন্দিরে" অন্তরে এই হিরণ্ময় কোষ মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি কর। এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা, তাহার অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে শুদ্ধ বুদ্ধ অশরীর পরমাত্মাকে দেখ। "অনিমিষ আঁখি সেই কে দেখেছে, যে আঁখি জগৎ পানে চেয়ে রোয়েছে"। এমন অনিমিষ আঁখি আর কোথায় আছে? তিনি আমাদের প্রতি চাহিয়াই রহিয়াছেন, শুধু চাহিয়া রহিয়াছেন নহে, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাকে একবার এমন সময়ে ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিব না? হৃদয়-মধ্যে উপলব্ধি করিব না? কেবল বৃথা কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াই কি গৃহে ফিরিয়া যাইব? শরীরকে অচলের ন্যায় ও মনকে দিক্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় স্থির করিয়া শ্রবণ কর—তিনি আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে বলিতেছেন, "ভক্তিযোগে ডাকিলে পরে থাকিতে পারি কৈ?" একবার ভক্তিযোগে তাঁহাকে ডাক। স্বর্গের দেবতারা যাঁহাকে নিয়ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, যে প্রেমাশ্রুতে তাঁহার প্রেম-মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, এস আমরা সকল সুহৃদে একবার উৎসবের সময় সেই প্রেম-মুখ ধ্যান করি—যাঁহার চরণ পূজা করিয়া দেবতারা অমৃতানন্দ লাভ করিতেছেন, এস আমরা সকলে মিলিয়া অনন্যমনে ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণ পূজায় প্রবৃত্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বেদী হইতে একটী উপদেশ দেন। ইনি বহুকাল দেশবিদেশের নানা-সৎশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন। এই জ্ঞান-গর্ভ উপদেশে তাহারই পরিচয়। আগামী বারে ইহাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের

অন্তঃপুরে মহিলা-সমাজ

স্ত্রীলোকের পঠিত উপদেশ।

ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা সকলে তাঁরই সন্তান। আজ আমাদের এত আনন্দ উৎসাহ কিসের? না, সারা বৎসরের পর সকল ভাই ভগিনীতে একত্রিত

হইয়া তাঁর পূজা করিতে, তাঁর গুণগান করিতে তাঁর কথা শ্রবণ করিতে আসিয়াছি। আজ তাঁরই ডাকে আমরা মিলিত হইয়াছি, সংসারের কোলাহল হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁর প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে আহ্বান করিতেছেন; এস আমরা হৃদয় খুলিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই, তাঁহার চরণে হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি। বৎসরের মধ্যে এমন সুযোগ আর পাইব না, এমন শুভদিন আমাদের অদৃষ্টে আর আসিবে কি না কে জানে। তাঁহার সঙ্গে সংশ্রব যদিও আমাদের একদিনের জন্য নয়, চির দিনই তিনি আমাদের পিতা মাতা দেবতা, তাঁহাকে পূজা করা আমাদের প্রতিদিনের কর্ত্তব্য, তাঁহাকে প্রীতি করা আমাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য, কিন্তু আজিকার দিন আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন—তাঁহার পূজা করিবার জন্য আজ আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। আমাদের যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে, এখান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া না যাই, প্রতিদিন নির্জনে তাঁহার পূজা আরাধনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি, এখানকার বাহ্যাড়ম্বরেই হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া না থাকে, এই উৎসব কোলাহলের মধ্যে যে চিরনবীন স্নেহ আমাদিগকে পাপের পথ হইতে সত্যের পথে আহ্বান করিতেছে তাহা আমরা বিস্মৃত না হই।

আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে অল্পে অল্পে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান-লাভ-স্পৃহা দিন দিন বলবতী হইতেছে, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে পরনিন্দা পরচর্চ্চার ভাব হ্রাস হইয়া আসিতেছে। গৃহে কলহ, বিবাদ ও পরনিন্দা লইয়া তাঁহাদের সময় কাটান আবশ্যক হয় না; লেখাপড়া প্রভৃতি সৎপ্রসঙ্গ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথন হইতে পারে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইলেও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তির ভাব যদি মুছিয়া যায় তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদ। বিদ্যাশিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে পরের উপকার দেশের উপকার এই সকল ভাব যেমন আসিতেছে, সেইরূপ জ্ঞান ধর্ম্মের প্রতি টানও আবশ্যক। আমরা যেন সেই মূল কারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ি, সেই পূর্ণ মঙ্গলের মঙ্গল ভাবে অবিশ্বাস করিয়া হৃদয়ের সৌকুমার্য্য না হারাই। মানবেরা কতদিন হইতে তাঁহার সৃষ্টি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া সকল বিষয় জানিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও এ বিশাল সৃষ্টির একটী ক্ষুদ্রতম পরমাণুকেও কেহ সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। যিনি এই সমুদায় সৃষ্টির কারণ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলেই যাঁহার নিয়মের অধীন, তাঁহাতে অনুরাগ ভিন্ন কে তাঁহাকে পাইতে পারে? তিনি আমাদিগকে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় সকলই দিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিব না, ভক্তিভরে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিব না, তবে আমরা এমন শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হইলাম কেন? ভক্তিভরে ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন। তিনি আমাদের হৃদয়ে চিরদিনই বর্ত্তমান—আমরাই তাঁহাকে হেলায় হারাই। জ্ঞানদ্বারা আমরা তাঁহাকে জানিতে পাই, কিন্তু প্রেম ভক্তি বিনা তাঁহার অপার আনন্দ অনুভব করা যায় না। তিনি আমাদের হৃদয়ে না চাহিতেই প্রেম দিয়া রাখিয়াছেন, প্রীতি ভক্তির ভাব আমাদের হৃদয়ে বিশেষ করিয়া অঙ্কিত ক-

রিয়া দিয়াছেন, আপনার দোষে আমরা সেই প্রীতি-পুষ্প দিয়া তাঁহার চরণ পূজা হইতে বঞ্চিত হই কেন; সেই অপার্থিব অবিচ্ছিন্ন সুখের অধিকারিণী হইয়াও পার্থিব সুখে আমরা ডুবিয়া থাকি কেন? পৃথিবীর তুচ্ছ ভালবাসার প্রতিদান দিবার জন্য আমরা ব্যাকুল, আর যিনি আমাদিগকে চিরকাল প্রেম দিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে কি হৃদয়ের প্রেম উপহার দিব না? বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আমরা যতই কেন যাহা বলি না, এই প্রেমভক্তির ভাব অশিক্ষিতদিগের নিকট হইতেও আমরা যথেষ্ট শিক্ষা করিতে পারি। ভক্তিভরে তাহারা বুকে হাঁটিয়া কত দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে, আমরা এত শিক্ষালাভ করিয়াও যদি দিনান্তে একবার সেই প্রেমদাতাকে স্মরণ না করি, তবে আমাদের কি দুর্ভাগ্য! যাহাতে আমাদের চিরকালের মঙ্গল হইবে, আত্মার উন্নতি হইবে, সে সকল বিষয়ে আমরা অন্ধ থাকিতে চাই। আপনার দোষে সন্তান সন্ততিদিগেরও হৃদয়ের ধর্ম্মভাব স্ফূর্ত্তি পায় না এবং মানবের ভবিষ্যৎ উন্নতি স্রোত কতকটা রুদ্ধ হইয়া আসে। আমাদের এ ভ্রম কবে দূর হইবে? এস, সব ভগিনীতে মিলিয়া পিতার নিকটে আশীর্ব্বাদ চাহি, যাহাতে ধৈর্য্য ক্ষমা অভ্যাস করিয়া চরিত্রকে উন্নত করিতে পারি, বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া পরস্পরের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারি, দীন দুঃখীকে দয়া ধর্ম্ম দ্বারা সুখী করিতে পারি, এবং যাহার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য তাহা পালন করিয়া তাঁরই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি।

ঈশ্বর! আমরা দুর্ব্বল, এই দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও যাহাতে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা প্রতিদিন তোমার উপাসনা করিতে পারি। আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। তুমি আমাদের পিতার পিতা পরমপিতা, তুমি আমাদের গুরুর গুরু পরমগুরু; তোমার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি গ্রহণ কর।

ভাই বোন সমিতি।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভাই বো'নেরা এক সঙ্গে মিলে-মিসে এই যে একটা সদনুষ্ঠানের গোড়া পত্তন করা হ'চ্চে—খুবই ভাল হ'চ্চে। ভালটা এই যে, উপস্থিত থেকে কাজ সুরু করা হ'চ্চে—উপস্থিত ছেড়ে অনুপস্থিতে হাত বাড়ানো হ'চ্চে না। টাট্‌কা টাট্‌কা নতুন—কালেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরোলেই পোড়ো'দের নজর গুলো আত্যন্তিক ফালাও হ'য়ে ওঠে; তখন তাঁদের প্রতাপ দেখে কে—"মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার!" তাঁদের—ভায়েদের সঙ্গে—বাপ মা'য়ের সঙ্গে—হয় তো আদা-কাঁচকলা; অথচ তাঁরা পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্যকে প্রেম-পাশে আলিঙ্গন কর'বার জন্যে কোল পেতে দিয়ে দাঁড়্য়ো আছেন! তাঁরা পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্য জাতির কাঙ্গালী—ভাইবোনের কোন ধার ধারেন না! কিন্তু মনুষ্যজাতি তো আর গাছে ফলে না—মনুষ্য-থেকেই মনুষ্য জাতির গোড়া-পত্তন সুরু হয়। দশজন মিল্‌লেই একটা দল হয়, দশ দল মিল্‌লেই একটা সমাজ হয়, দশ সমাজ মিল্‌লেই একটা জাতি হয়। ভাই বো'ন থেকে অল্পে অল্পে পা বাড়া'তে সুরু ক'রে মনুষ্য জাতিতে পেঁাছোতে হয়—তা গেল দূরে—আগেভাগেই মনুষ্য জাতি! গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁধি! আসল কথাটা কি তবে বলি শোনো;—প্রত্যেক মানুষেরই অন্তঃকরণের দুওরের গোড়ায় কাণ পাত'লে মানুষ আর পশু দুয়েরই হাঁক ডাক শুন্‌তে পাওয়া যায়। ভালুক নাচ দেকেছ তো—একবার মানুষ ভালুককে নীচে ফেলে তার উপরে উঠ্‌চে, একবার ভালুক মানুষকে নীচে ফেলে তা'র উপরে উঠ্‌চে; প্রত্যেকের মনের ভিতর মানুষ আর পশুর মধ্যে অষ্ট প্রহর এইরূপ কোস্তাকুস্তি চল্‌চে; অন্তরের মানুষটি যদি অন্তরের পশুগুলোকে একবার বশ ক'রে ফেল্‌তে পারে—কা'উকে বা থাব্‌ড়া থুব্‌ড়ি দিয়ে—কা'রো বা গায়ে হাত বুল্‌য়্যে—কাউকে বা ধমক ধামক দিয়ে—কারো উপরে বা চোক রাঙ্‌য়্যে—কাউকে বা চাবুক মেরে—কা-

উঁকে বা অঙ্কুশ মেরে—একবার যদি কোন রকম ক'রে পশুগুলোকে বশ ক'রে ফেল্‌তে পারে, তবে তাকে আর পায় কে? মনের বাঁদর তার কাছে এমনি পোষ মেনেচে—যে, আর সেটাকে দড়া-দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্‌তে হয় না; অহংকারের বাঘ তার কাছে এমনি পোষ মেনেচে যে, আর তাকে পিঁজ্‌রের ভিতরে পুরে রাখ্‌তে হয় না; বুদ্ধির ঘোড়া তার কাছে এমনি পোষ মেনেচে যে, আর তা'র সইসের দরকার হয় না—আপনিই পথ চিনে চল্‌তে পারে;—এ যা'র হ'য়ে চুকেছে—সে-ই তো মহাপুরুষ! বাঘ যা'র ঘরের পোষা জন্তু, তা'র শত্রু তার কাছে এগো'তে সাহস পায় না—কি জানি যদি সে বাঘটাকে লেল্‌য়ে দেয়;—কিন্তু সে নিতান্ত উত্ত্যক্ত না হ'লে আর কারো উপরে বাঘ জারি করে না; কেন না, রক্তের আস্বাদ পেলে পোষা বাঘ বুনো হ'য়ে বেঁকে দাঁড়াতে কতক্ষণ? অন্তরস্থিত পশুগুলো যখন অন্তরস্থ মানুষটির অনুগত ভৃত্য হয়, তখনই মানুষটি মাথা তুলে দাঁড়ায়, ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মানুষের অন্তরস্থিত মানুষটিকে আমরা বলি—মনুষ্যত্ব, আর মানুষের অন্তরস্থিত পশুগুলোকে আমরা বলি—পশুত্ব। সেই যে অন্তরস্থিত মানুষ কিনা মনুষ্যত্ব, তা'রই দৌলতে মানুষ-মাত্রই পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সকল মনুষ্যেই মনুষ্যত্ব আছে, তাই সকল মনুষ্যই পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের বীজ মাটি চাপা রয়েছে—যেমন বেলা'র মনে; কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের অঙ্কুর দেখা দিয়েচে—যেমন দীনুর মনে; দীনু কোন খাবার জিনিস পেলে নলিনীকে তা'র ভাগ না দেওয়া কাপুরুষের কাজ মনে করে, কিন্তু সব সময়ে লোভ সাম্‌লাতে পারে না। কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের পাতা গজ্‌য়েচে বা গজাচ্চে—যেমন বর্ত্তমান সমিতির উদ্যোগী শ্রীমান্‌ বাবাজিদিগের অন্তঃকরণে; কে তাঁরা? না

হিতু নীতু ক্ষিতু কুতু, সুরেন বিবি, বলু সুধী।
জ্যোৎস্না সরলা—কি আর বল্‌ব—সর্ব্বগুণে গুণাম্বুধি॥

কারো বা অন্তঃকরণে মনুষ্যত্বের ফুল ফুটেচে, বা ফুট্‌চে; তাঁরা হ'চ্চেন এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষীয় গুরুলোক, তাঁদের গুণে গেঁথে নাম করাটা ভাল দেখায় না। কারো বা মনে মনুষ্যত্বের ফল ফলেচে বা ফল্‌চে; কিন্তু আছে সেটি সকল মানুষেরই অন্তঃকরণে। তাই বলি যে, সমগ্র মনুষ্য জাতিকে প্রেমের টানাজালে হাৎয়ে পাবার জন্যে সহরময় দাপ্‌টে বেড়াবার প্রয়োজন করে না—সমগ্র মনুষ্য-মণ্ডলী প্রত্যেক মানুষেরই মনের অন্তঃপুরে গোকুলে বাড়্‌চে—সেটি আর কিছু নয় অন্তরস্থিত মানুষ—মনুষ্যত্ব। এক দিন না একদিন সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে উঠবেই উঠবে—তা যখন সে ক'রবে, তখন অন্তরস্থিত বাঘ ভাল্লুকগুলো একেবারেই তার পদানত দাস হ'য়ে প'ড়বে। সেই যে অন্তরস্থিত মনুষ্য কি না মনুষ্যত্ব—সেইটিই সমস্ত মনুষ্য-জাতিকে প্রেমে বাঁধবার টানা জাল। সেই ভিতরের মানুষটিকে ভাল বাসলেই পৃথিবী-শুদ্ধ সমস্ত মানুষকে ভাল বাসা হয়—পর ভেবে অযত্ন ক'রলেই পৃথিবী-শুদ্ধ সমস্ত মনুষ্যকে পর ক'রে গ'ড়ে তোলা হয়। একদিকে যেমন দেখা যায় যে, মনুষ্যত্ব আমাদের প্রত্যেকের ভিতর-মহলে বর্ত্তমান র'য়েচে; আর এক দিকে তেমনি দেখা যায় যে, বাইরের পাঁচ জন মানুষের—বিশেষতঃ সাধু সজ্জনের—ভাব এবং কাজ দেখে তা-থেকেই আমরা মনুষ্যত্ব সংগ্রহ ক'রে এনে আপনার আপনার অন্তঃকরণের ভিতরে পুঁজি করি। এখানে এইটি দেখা আবশ্যক যে, মনুষ্যত্ব ব'লে যে একটি রত্ন আছে, সেটি বাইরে-থেকে সংগ্রহ ক'রে আন্‌তে হ'লেও ভিতরে একজন জহরী আবশ্যক। কেননা ভিতরের জ্ঞানই বাহিরের পাঁচজনের জ্ঞানকে চিন্‌তে পারে, ভিতরের প্রেমই বাহিরের পাঁচ জনের প্রেমকে চিন্‌তে পারে, ভিতরের মনুষ্যই বাহিরের পাঁচ জন মানুষকে চিন্‌তে পারে; অজ্ঞান জ্ঞানকে চিন্‌তে পারে না, অপ্রেম প্রেমকে চিন্‌তে পারে না, পশু মানুষকে চিন্‌তে পারে না। ভিতরে যা'র মনুষ্যত্ব আছে সেই ব্যক্তিই মনু-

ষ্যত্ব দেখলে তৎক্ষণাৎ তা চিনে নিতে পারে। তাই বলি যে, মনুষ্য মাত্রেরই মনের ভিতরে মনুষ্যত্ব গোকুলে বাড়চে; পাঁচ জনের দেখে শুনেই হোক্—বা বিপদে প'ড়ে ঠেকে শিখেই হো'ক—বা সদ্‌গুরুর উপদেশেই হোক্—বা বই প'ড়েই হো'ক—কোন গতিকে সেই অন্তরস্থ মানুষটির চোক ফুটলেই সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে উঠবে। ঘরের হাতি দিয়ে যেমন বনের হাতি ধ'রে এনে তাকে ঘরে পোষ মানাতে হয়, তেমনি, অন্তরের মনুষ্যত্ব দিয়ে বাহিরের মনুষ্যত্ব ধ'রে এনে তাকে অন্তরে পুষতে হয়। অতএব, মনুষ্যত্ব সবা'রই অন্তরে বর্ত্তমান আছে—বাইরের পাঁচ জনের মনুষ্যত্ব সেই অন্তরের মনুষ্যত্বেরই রসদ যোগায়। কিন্তু সেই যে দুর্লভ রত্ন মনুষ্যত্ব তা'র খনি কোথায়? তা'র খনি হ'চ্চে আত্মা। আত্মাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব;—আত্মাকে ছেড়ে মনুষ্যত্ব শুধু কেবল একটা ফাঁকা আওয়াজ! আত্মা হ'তেই মনুষ্যোচিত কাজ ফুটে বেরোয়—আর, সেই মনুষ্যোচিত কাজের মধ্যেই আমরা মনুষ্যত্বের পরিচয় লাভ করি। কাউকে যদি দেখি যে, সে টাকার লোভ সাম্‌লাতে না পেরে চুরির পন্থায় ফির্‌চে—তবে সে যে তা'র কাজ সেটা মনুষ্যোচিত কাজ নয়—সেটা বিড়ালোচিত কাজ; পষ্টই দেখা যা'চ্চে যে, সেরূপ কাজে আত্মার কোন হাত নেই—বাহিরের জিনিসের প্রবল আকর্ষণই সে কাজের মূল। সেরূপ কার্য্য যে যখন করে, তখন তা'কে বাহিরের জিনিসের আকর্ষণ নাকে দড়ি দিয়ে চালায়। আর-এক ব্যক্তিকে যদি দেখি যে, সে ঈশ্বর-প্রেমে গদগদ হ'য়ে আপনার শত্রুর সঙ্গে ভায়ে'র মত ব্যবহার ক'চ্চে—তবে তার সে কাজটিতে বাহিরের জিনিসের কোন হাত নেই—আত্মাই সে কাজের হা'ল ধ'রে ব'সে আছে। এইরূপ আমরা পাচ্চি যে, মনুষ্যোচিত কার্য্যেই মনুষ্যত্ব হয়—আর, আত্মাই মনুষ্যোচিত কার্য্যের কর্ণধার; তবেই হ'চ্চে যে, আত্মা মূল—মনুষ্যত্ব তা'র ফল। পৃথিবী-শুদ্ধ মনুষ্য-জাতির ভালবাসা থেকে আমরা চল্‌তে সুরু কল্লুম—চল্‌তে চল্‌তে শেষকালে আমরা আপনার আপনার ভিতর-মুলুকে আত্মাতে এসে পড়্‌লুম্। মনুষ্য-জাতি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে মনুষ্যত্ব বেরয়ে পড়্‌লো—মনুষ্যত্ব খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে আত্মা বের্‌য়ে পড়্‌লো—নির্জীব কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে জ্যান্ত সাপ বের্‌য়ে প'ড়্‌লো; তোমরা দেখ্‌চি ভয়ে পিছোচ্চো—কিন্তু যদি তোমরা বীর-পুরুষ ও বীর-কন্যা হও তবে সাপের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভয় না পেয়ে—তা'র মাথা থেকে সাত রাজার ধন মাণিক সংগ্রহ কর্‌বার জন্যে কোমর বেঁধে তাকে ঘিরে দাঁড়াও—তা'কে কোন মতেই পালাতে দিও না।

আমি চাই এই যে, তোমাদের এই ভাই বো'নের সমিতির মধ্যে-থেকে জাগ্রত জীবন্ত আত্মার ভাব প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠুক্; সেই আত্মার ভাবটি প্রথমে জ্যান্ত সাপের মত ভয়ানক—কেননা প্রথমে সেটা প্রতি জনের স্বার্থের বিরোধে ফণা ধ'রে ওঠে। তুমি চাও যে, শুধু কেবল তোমারই ভাল হো'ক্, আর সকলের কারো কিছু হ'য়ে কাজ নেই; কিন্তু আত্মা বলে যে, সকলের ভালই তোমার ভাল; কেননা, সকল শরীরের পক্ষে যা ভাল—তা হাতেরও ভাল—পায়েরও ভাল—বুকেরও ভাল—মাথারও ভাল; কিন্তু যা শুধু কেবল জীভের পক্ষে ভাল কিন্তু পেটের পক্ষে এবং আর আর সমস্ত শরীরের পক্ষে খারাপ—তা সকলের পক্ষেই খারাপ—জীভের নিজের পক্ষেও খারাপ; কেননা, তাতে জীভেও ক্রমে ক্রমে এরূপ অরুচি ধরে—যে আগে যা তা'র কাছে মিষ্টি লাগ্‌তো, শেষে তাও তা'র কাছে তিতো হ'য়ে দাঁড়ায়। এই জন্য যাঁরা শুধু কেবল আপনার ভালটিই চেনেন—তাঁদের কাছে আত্মার ভাব জ্যান্ত সাপের মত ভয়ানক। কিন্তু যাঁরা সকলের ভাল'র সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভাল চা'ন—তাঁদের কাছে সাপটি নত-শির হ'য়ে আপনার মাথার মাণিকটি তাঁদের পদতলে ঢেলে দেয়। সে মাণিকটি সকল ঐশ্বর্য্যের

সেরা ঐশ্বর্য্য;—কি ? না মনের অপরাজিত অদ্ভুত ক্ষমতা—যা'র প্রভাবে বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক মহিষ গণ্ডার সকলেই নতশির হ'য়ে মানুষের পা চাট্‌তে থাকে। বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক কি না মনের ব্যাঘ্র ভল্লুক—দ্বেষ হিংসা বিবাদ কলহ—ইত্যাদি। সকল শরীরের মধ্যে যেমন এক আত্মা—তেমনি তোমাদের সকলের মধ্যে এক আত্মা জেগে উঠুক্—তোমরা সকলে একাত্মা হও। এই একাত্মভাবটি যখন তোমাদের মধ্যে দিয়ে রীতিমত ফুটে বেরো'বে—তখন তারই ভিতরে স্বর্গের সিঁড়ি খুলে যা'বে। কিন্তু সেই যে একাত্মভাব তা শুধু মুখের একাত্ম-ভাব হ'লে চল্‌বে না—কাজের একাত্মভাব, প্রাণের একাত্মভাব এবং জ্ঞানের একাত্ম-ভাব হওয়া চাই ;—সেটা যে, কি রূপ তা আরেক দিন ব'লবো ; আজ কেবল একাত্মভাবের ইঙ্গিত মাত্র ক'রে ক্ষান্ত হ'চ্চি ;—এক দিনে সব কথা ব'লতে গেলে হয় তো সব কথাই এক সঙ্গে ঘুলিয়ে গিয়ে সবই ভণ্ডুল হ'য়ে যা'বে; তায় কাজ নেই—আজ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

আয় ব্যয়।

আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৬২৫ /০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৬৫২।৵১৫
সমষ্টি	৫২৭৭।৶১৫
ব্যয় ...	২৬৯৬ ৶ ৫
স্থিত	২৫৮১। ১০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১২১৮৴১৫
মাসিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮০৯ শকের ফাল্গুন হইতে ১৮১০ শকের আশ্বিন পর্য্যন্ত	২৲
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲
" " অনঙ্গমোহন চৌধুরী (তুষভাণ্ডার)	২০৲
" " শম্ভুচন্দ্র মিত্র	৫৲
" " অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
" " ভুমেশচন্দ্র বসু	২৲
" " হরকুমার সরকার (বোয়ালীয়া)	২৲
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	১৲
" " হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফিরোজপুর)	১॥৵০
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর রায় (ক্ষেতুপাড়া)	৬০৲
" " কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর)	১৲
" " ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস (উনাও)	১৲
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী	২৲
শুভ কর্ম্মের দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু ভবদেব নাথ (গোয়াড়ি)	৫৲
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাণ্ডুয়া)	৩৲
দানাধারে প্রাপ্ত ইত্যাদি বিবিধ আয়	৪৶১৫
	১২১৮৴১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫১৩॥০
পুস্তকালয় ...	৬৬।৵১০
যন্ত্রালয় ..	১৬৮২॥ ১৫
গচ্ছিত ...	২০৮।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩২॥০
সমষ্টি	২৬২৫/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৬৪৩৮৵৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৮৮ ৶৫
পুস্তকালয়	১২৪॥/১৫
যন্ত্রালয়	১৪২৬॥৫
গচ্ছিত	৫১॥৵১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩।/০
দাতব্য	৫৮৲
সমষ্টি ...	২৬৯৬৶৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক

দ্বাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

৫৪৮ সংখ্যা ১৮১০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

বালি ধর্ম্মসভা।

দেখিতে দেখিতে বর্ষচক্র বিঘূর্ণিত হইয়া আমাদিগকে অত্রস্থ ধর্ম্মসভার ষষ্ঠ বৎসরে আনয়ন করিল, যোগানন্দ প্রেমানন্দের নবতর উৎস আমারদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল, ভবিষ্যতের কল্যাণ-গর্ভ যবনিকা আমারদের সম্মুখে জ্বলন্ত আশা ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইল। আজ আমারদের আনন্দের সীমা কি! আজ স্বদেশ বিদেশস্থ বন্ধু বান্ধবে সম্মিলিত হইয়া যে শুভদিনের জন্য এতকাল সস্পৃহ ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম সেই শুভক্ষণে পবিত্র মুহূর্ত্তে তাঁহার নামগানে দিক্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছি, এক হৃদয়ে এক প্রাণে জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহার অঙ্গুলির নির্দ্দেশের দিকে ধাবমান হইতেছি। বিষয়ের নীচ কামনা আমাদিগকে আর পশ্চাৎপদ করিতে পারিতেছে না। এক্ষণে আমরা সংসারের অতীত দেশে বিচরণ করিতেছি, অন্তরে জাজ্বল্যমান অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়-সিংহাসনে বর্ত্তমান, মর্ত্তের ক্ষুদ্র কীট হইয়াও আমারদের জ্ঞানচক্ষু তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়াছে, তাঁহার ও আমারদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই, একি দেবস্পৃহনীয় ব্যাপার। আমরা সেই বিশ্বজননী পরম মাতার উদার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার প্রেমমুখের উপরে সস্পৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি, তাঁহার অনিমেষ নয়ন আমারদের দৃষ্টির উপরে নিপতিত রহিয়াছে, আমরা বিভোর হইয়া তাঁহাকেই দেখিতেছি, তাঁহাকেই ডাকিতেছি, বিষয়ের দারুণ কোলাহল আমাদিগের বধির কর্ণকে আর স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্যের নিদারুণ চিন্তা আমাদিগকে আর আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না; প্রসন্ন-জনন তাঁহার প্রেমমুখ দেখিয়া এখানকার সকল জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছি, একি অলৌকিক সম্মিলন।

আমরা অন্তরে যে ধর্ম্মবৃক্ষ রোপণ করিয়াছি এই ব্রাহ্মসমাজ তাহার বাহিরের বিকাশ মাত্র। আমরা যে ধর্ম্মভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, যে পরিশুদ্ধ বিমল আনন্দে আপনি অপার শান্তি লাভ করিতেছি, তাহা বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সজন

নগরের মধ্যে বিস্তার করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। নিজজীবনে কোন নূতন সত্য লাভ করিয়া যতদিন না আত্মীয় স্বজনের মধ্যগত হইয়া উপভোগ করি, ততদিন মনুষ্যহৃদয়ে শান্তি নাই। সেই জন্যই নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উপহাস অত্যাচার স্বীকার করিয়াও ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণ এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উজ্জ্বল আলোকমালায় বা প্রভূত আড়ম্বরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নত লক্ষ্য প্রতিভাত হয় না, বক্তৃতার স্রোতে বা তর্কতরঙ্গে ইহার স্বর্গীয় ভাব বিকশিত হয় না। হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে দেবদেব মহাদেবকে বর্ত্তমান দেখিয়া গোপনে নির্জ্জনে নিত্যকাল বা সায়ংসন্ধ্যায় তাঁহার সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া যে ধর্ম্মভাব পোষণ করিতেছিলাম, সাপ্তাহিক উপাসনার বা আজিকার উৎসবে, সকল ভ্রাতার মধ্যে সেই স্বর্গীয় ভাবের বিনিময়ে আপনাকে সংস্কৃত করিয়া বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য, সকলকে এক পথের পথিক জানিয়া পথশ্রমকে বিদূরিত করিবার জন্য, সাংসারিক অভ্যুদয়ে বা বিপৎপাতে অপরের দৃষ্টান্তে বা উপদেশে আপনাকে গম্যপথে স্থির রাখিবার জন্য, অপরের জ্বলন্ত উৎসাহে আপনাকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই ঈদৃশ সাধু সম্মিলনের নিতান্ত প্রয়োজন। সেই জন্যই আজিকার এত উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি আমারদের মধ্যে জাগিতেছে।

এই আনন্দ কোলাহল এই উৎসব আমোদের মধ্যে যেন আমরা আপনাকে বিস্মৃত হইয়া শূন্য হৃদয় লইয়া ফিরিয়া না যাই। এই উৎসব আনন্দের মধ্যে যেন আমরা এই পবিত্র উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বিস্মৃত না হই। আজ আমারদের আধ্যাত্মিক ক্ষতিলাভ গণনার দিবস। সম্বৎসরকাল যাঁহার উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া এই উৎসবক্ষেত্রে আগমন করিয়াছি তাঁহার প্রতি আমারদের নির্ভরের ভাব কতদূর অগ্রসর হইল, হৃদয়সিংহাসনে তাঁহার জ্বলন্ত মূর্ত্তি কত সুস্পষ্টরূপে সন্দর্শন করিতে পারিলাম, তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস করিয়া পৃথিবীর প্রবল ঘূর্ণায় পতিত হইয়াও কিরূপ ধৈর্য্যের সহিত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম; ইন্দ্রিয়কুলের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মনতরীর হাল কিরূপ তৎপরতার সহিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিতে সক্ষম হইলাম, একাগ্রমনে কতকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইয়া জীবনকে মধুময় করিতে সমর্থ হইলাম, অপরের জন্য অসঙ্কুচিত ভাবে কতদূর আত্মবিসর্জ্জনে কৃতকার্য্য হইলাম, আজ তাহারই আলোচনার দিবস। সম্বৎসরকাল যদি আপনাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখিয়া আধ্যাত্মিক বললাভে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, দিনে নিশীথে তাঁহার গুণগানে মনুষ্যজন্ম সফল করিয়া থাকি, যদি অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া—বিষয়-চিন্তা হইতে মনকে কতক পরিমাণে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইয়া থাকি তবে এ উৎসবের নিশা কি আনন্দের নিশা। এই সম্বৎসরকাল মধ্যে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের কত আবর্ত্তন হইয়া গেল, পক্ষমাস ঋতু ধরাতলকে স্পর্শ করিয়া আবার অসীম বেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল, জন্মবৃদ্ধির হাস্যোল্লাস, জরামৃত্যুর গগনভেদী আর্ত্তনাদে দিক্ বিদিক প্রতিধ্বনিত হইল, এই সকল চঞ্চল ঘটনার মধ্যগত হইয়াও যদি আমরা সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি, যদি ধ্রুবসত্য সনাতনের প্রতি

আমারদের প্রেম-দৃষ্টি নিপতিত হইয়া না থাকে, যদি পুত্রকলত্রের বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারের সুখসম্পত্তিকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া থাকি, তবে এই ঘোর উৎসব-আনন্দের মধ্যে তীব্র গরল উত্থিত হইয়া গাঢ়নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া দিয়া—অনুতাপের ক্রন্দনে আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে, মোহ-যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া আমাদের মর্ম্মভেদী শোচনীয় অবস্থার দিকে নয়নকে আকৃষ্ট করিতে থাকিবে, মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সম্মুখে ধারণ করিবে। যাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি পবিত্রতায় আপনাকে উন্নত করিয়াছেন, তাঁহারদেরই বিমল হৃদয়ে আজ স্বর্গের পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে, আর যাঁহারা সংসারের পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারদের অন্তরে উৎসবের পবিত্র ভাব প্রবল উদাস ঝটিকা উত্থিত করিয়া দিয়া তাঁহারদের অন্তরের শান্তি হরণ করিবে ও এককালে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিবে।

ধর্ম্মের এমনই পবিত্র ভাব, সত্যের এমনই স্বর্গীয় সুষমা, যে ইহার আলোচনা পাষাণহৃদয় ঘোর পাষণ্ডের মনকেও বিনা তর্কে আকুল করিয়া তোলে। যিনি অতুল সম্পদে স্ফীত হইয়া আপনাকে অবিনাশী জ্ঞান করিতেছেন, ঈশ্বরচর্চ্চার প্রতিধ্বনি তাঁহার কর্ণকে স্পর্শ করিলেই তিনি সচকিত হইয়া উঠেন। যখন রাজগণরাজা ত্রিভুবন-পরিপালক ধর্ম্মরাজ্যের রাজা এবং যখন তিনি স্বয়ং ইহার প্রবর্ত্তক, তখন যে কীটাণুকীট ক্ষুদ্র মনুষ্য তাঁহার শাসন-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি যে তাঁহার রাজনিয়মসকল প্রতি হৃদয়ে জ্বলন্ত অবিনশ্বর অক্ষরে স্বয়ং মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, আমরা আপনার দোষে বিনা-কারণে রাজদ্রোহী হইয়া আপনার মস্তকে অজানিত বিপদ আপনা হইতে আনয়ন করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছি! তিনি যে তাঁহার উদার ক্রোড় আমারদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিত্য উদার সদাব্রতে লালিত পালিত হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে সহজে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না! তিনি যে আমারদের আত্মাকে কত সূক্ষ্ম কৌশলে গঠিত করিয়া তাঁহাকে জানিবার প্রশস্ত অধিকারে অধিকারী করিয়াছেন, আমাদিগকে সকল জীবের রাজা করিয়া ধর্ম্মভাব সাধুভাবের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, তথাপি আমরা তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে গিয়া পৃথিবীর অনিত্য খ্যাতি প্রতিপত্তি যশোমান লাভে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি! তিনি যে আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া ধর্ম্মনিয়মের অধীন করিয়া দিলেন, আমরা সকল নিয়মের শৃঙ্খল পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছি! সেই পুণ্যপাপদর্শী পরমেশ্বর সকলই দেখিতেছেন সকলই জানিতেছেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিব না। আমারদের একি মোহ! আমারদের কি দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান হইবে না। আমরা কি চিরকাল পতঙ্গের ন্যায় অনলে আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়া বিনা কারণে দগ্ধ হইতে থাকিব!

চিরনিদ্র বিষয়ীর মোহনিদ্রা অপসারিত করিয়া তাহাকে সচকিত করিবার জন্য, ঈশ্বরপ্রেমী পুণ্যাত্মার উৎসাহজনক

মুখশ্রীকে আরও প্রফুল্লিত করিবার জন্য এখানকার উৎসব দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এখানে ধনী দরিদ্র পাপী পুণ্যবান কাহারও আসিবার বাধা নাই, সকলে নিজ নিজ অতীত জীবন আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত কর। উঠ, জাগ্রত হও, আর কতকাল মোহে অভিভূত থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি";

উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া পরা বিদ্যার উপদেশ গ্রহণ কর, সাধুসঙ্গে হৃদয়ের মলা প্রক্ষালিত কর, তুমি যে পথে পদার্পণ করিবে সেই ধর্ম্মপথ অতিশয় দুর্গম, পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হও। পণ্ডিতেরা এ পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় বলিয়া গিয়াছেন। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, যিনি ভূমা যিনি মহান তিনিই সুখ স্বরূপ, তাঁহার ভজন সাধনে আপনাকে নিয়োগ কর, নশ্বর ক্ষুদ্র পদার্থে বা চঞ্চল মনুষ্যের প্রেমে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাতেই উন্মত্ত হইয়া প্রতারিত হইও না। সংসার ভয়াবহ মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি; এখানে যাহার জন্ম তাহার ক্ষয়, যাহার জয় পরক্ষণে তাহারই পরাজয়। গঙ্গাস্রোতের ন্যায় এমন চঞ্চল অবস্থার উপরে আপনার সুখের ভিত্তি নিখাত করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইও না। সময় থাকিতে থাকিতে প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও, তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নির্ভয় হও। তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার সঙ্গে আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছার সম্মিলনে বিপদের কঠোরতা বিদূরিত কর, যে শোক সন্তাপের তীব্রতা ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, তাঁহাকে জ্বালা যন্ত্রণার অভেদ্য দুর্গ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইবে।

আমরা পবিত্র ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কালের করাল মুখব্যাদানে তাঁহারদের কীর্ত্তি কলাপ সকলই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে পবিত্র তেজীয়ান মন্ত্রে স্বরস্বতী-কূল প্রতিধ্বনিত করিতেন, বেদ উপনিষদনিহিত সেই সকল অমূল্য রত্নের সিদ্ধবিদ্যার অধিকারী হইয়া আমরা তাঁহারদের পবিত্র প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ বহু শতাব্দী পরে সেই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আর্য্যকুল-দেবতার আরাধনা করিতেছি। আমরা গভীর সাধনায় পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণলভ্য তাঁহারদের ও আমারদের নিজস্ব কুলদেবতাকে লাভ করিতে পারিব, এই আমারদের আন্তরিক বিশ্বাস। সেই জন্যই আমরা তাঁহারদের নির্দ্দিষ্ট প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেছি, বিশ্বাস ও কার্য্যে তাঁহারদের আর্য্যভাব রক্ষা করিতেছি। সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন সময়ে তাঁহারা ঈশ্বরলাভে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, যে এই ঊনবিংশ শতাব্দির জ্ঞানালোকপরিপূর্ণ সভ্য সমাজ তাহা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই সাধন তপস্যায় প্রকৃত হিন্দুভাব রক্ষা করিতে আমরা এত ব্যাকুল, তাঁহারদের পদানুসরণ করিতে এত ব্যস্ত।

আমরা জড়শরীর মন ও আত্মার সমষ্টি। ব্যায়াম শিক্ষা ও অঙ্গসঞ্চালনে যেমন শারীরিক বল পরিবর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে যেমন মানসিক সৌন্দর্য্য পূর্ণায়তন লাভ করে, তেমনই ঈশ্বরচিন্তা ও তদানুসঙ্গিক শ্রদ্ধা ভক্তিরও স্নেহমমতার বর্দ্ধনে মনুষ্যের আত্মা স্বর্গীয় শোভা ধারণ করে। শরীরের সঙ্গে আমারদের অনিত্য সম্বন্ধ, আত্মা এখানকার সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলাফল ভোগ করিতে করিতে ইহলোক

হইতে লোকান্তরে গমন করিবে। শরীর পঞ্চভূতে মিলিয়া যাইবে। যিনি আমারদের চিরসঙ্গী, যিনি আমারদের ইহকালের নিয়ন্তা পরকালের সহায় ইহজীবনের বিনাশেও যেন সেই অমূল্য রত্নকে ক্রয় করি। যাঁহা হইতে শরীর মন প্রাপ্ত হইয়াছি আইস তাঁহারই কার্য্যে ইহাকে আহুতি দিয়া আত্মার প্রাণকে পরিপুষ্ট করি। মৃত্যু আসিয়া বাধ্য করিবার পূর্ব্বেই আইস আমরা সহজে তাঁহার নিকট আত্ম সমর্পণ করি। মায়াময় সংসারের সেবাতেই আমারদের প্রকৃত অধীনতা, তাঁহাকে প্রীতি করায় ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই আমারদের প্রকৃত স্বাধীনতা। তাঁহার কার্য্যেই মনুষ্য ভূমানন্দ লাভ করিতে পারে, এ আনন্দের বিরাম নাই, দেবতারাও এ আনন্দের ভিখারী।

আমরা এই পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যেন ধর্ম্মমদে উন্মত্ত হওত সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট না হই, ধর্ম্মোন্মাদের কুজ্‌ঝটিকা আমারদের গন্তব্য পথকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, হৃদয়কে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তোলে, হৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্ব হইতে মনুষ্যকে পরিভ্রষ্ট করে। যাহা ধর্ম্মের প্রতিরূপক বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া আমারদের সম্মুখে প্রতিভাসিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, বাহিরের আড়ম্বরের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনে যতই বহির্মুখী ভাব প্রবল হইবে ততই মনে করিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সাধনের ভাব খর্ব্ব হইতেছে। আমরা বহুকাল পরে বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি, অসূয়া পরনিন্দা যেন আমারদের মধ্যে স্থান না পায়। শান্তোদান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। অন্তরিন্দ্রিয়লৌল্য হইতে মনকে নিবৃত্ত কর, বহিরিন্দ্রিয়গণকে শাসন কর, যুক্তমনা যুক্তকর্ম্মা হও, ক্ষমাপরায়ণ হও, তবে আত্মরূপ দর্পণে পরমাত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখিবে। চিত্তক্ষেত্রকে পবিত্র করিয়া তাহাতে ব্রহ্মরূপ বীজ নিহিত করিলে কালসহকারে উহার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় আপনার কাতর প্রাণকে শীতল করিতে পারিবে নহিলে ব্রহ্মসাধন বিড়ম্বনা মাত্র।

হে পরমাত্মন্! ব্রহ্মসাধনের কঠোরতা জানিয়াও আমরা তোমার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন আপনার দুর্ব্বলতার উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আর পরিত্রাণের কোন আশা থাকে না। তুমি আমারদের সর্ব্বস্ব, তুমি তোমার পবিত্র স্বরূপের দিকে আহ্বান না করিলে আমরা আপনা হইতে তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি না। আমারদের প্রাণের এমন কি মূল্য, আমারদের সাধনের এমন কি প্রভাব যাহাতে তোমাসম অমূল্য রত্নকে লাভ করিয়া কৃতপুণ্য হইতে পারি। তুমি আমাদিগকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর। হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করিয়া দাও; ধর্ম্মভাব ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদীপ্ত কর, তোমার সংমোহন মূর্ত্তি দেখাইয়া আমারদের নয়নকে এমনই শীতল কর, যেন আর পৃথিবীর দিকে আমরা ফিরিয়া না যাই। যাঁহারা ধর্ম্মবলে উন্নত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আনন্দের পর আনন্দ বিধান করিয়া তোমার দিকে আরও আকৃষ্ট কর। যাঁহারা তোমার অজস্র করুণার মধ্যে থাকিয়াও তোমার প্রতি বিমুখ, মাতা যেরূপ রুগ্ন সন্তানদিগের প্রতি অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করেন তেমনই তাহাদিগকে তোমার আলিঙ্গন-পাশে গাঢ়রূপে আবদ্ধ কর, সস্নেহ বচনে হস্তধারণ করিয়া তাহা-

দিগকে তোমার পথের পথিক কর। তোমার করুণাই আমারদের আশা ভরসা সকলই। তোমার দয়ায় শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর আমারদের মৃতপ্রায় অসাড় আত্মা হইতে কি প্রার্থনা ধ্বনি উত্থিত হইয়া তোমার পাদমূল স্পর্শ করিবে না, আমারদের হৃদয়তন্ত্রীতে অনবরত মধুর ব্রহ্মনাম নিনাদিত হইবে না। আমরা তোমার অধম সন্তান, তোমার সৃষ্টি রাজ্যের ক্ষুদ্র বালুকণা। তুমি আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর দাও যেন লোকলোকান্তরে তোমার নাম গাহিতে গাহিতে, তোমার পবিত্র নাম মহীয়ান করিতে করিতে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে পারি। তোমার দ্বারের ভিখারী হইলে কেহ শূন্য হৃদয়ে শূন্য হস্তে প্রতিনিবৃত্ত হয় না এই বিশ্বাসে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আস্তিক্য বুদ্ধি।

মনুষ্যের সঙ্গে বাহিরের যতটুকু ঘনিষ্ট যোগ, তাহা হইতেই সে স্পষ্ট দেখিতে পায় যে সে আপনাতে আপনি পূর্ণ নহে। আহার, বিহার, শয়ন উপবেশন, স্বাস্থ্যলাভ সুখবর্দ্ধন সকল বিষয়েই সে বাহ্য জগতের মুখাপেক্ষী। বাহ্য জগতের ক্রোড়ে এইরূপ লালিত পালিত হইতে হইতে তাহার মনে আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়; কোথায় হইতে বা আমি আসিলাম, বাহ্য জগত বা কোথা হইতে আসিল? যতদিন না তাহার মনে এক সরল মীমাংসা স্থান পায়, ততদিন আর তাহার প্রাণের ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি নাই। আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয় হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে সে দেখিতে পায় যে, আমি দেশ কালে বদ্ধ, আমি ইচ্ছা করিয়া এখানে আসি নাই, সংসার-প্রবাসে কতদিন আমাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে আমার পিপাসা ভৌতিক উপাদানে কিরূপে শান্ত হইবে তাহাও জ্ঞাত নহি। আমি চারিদিকে একটি দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার অতীত দেশে গমন করা আমার পক্ষে যার পর নাই দুঃসাধ্য। এ সীমা কোথা হইতে আসিল? বাহ্য জগতকে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের শৃঙ্খল কে পরাইয়া দিল?

আপনার অস্তিত্বের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই আমি পিতা হইতে, পিতা পিতামহ হইতে, তিনিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে হইলে আমরা একটি অনন্তকালব্যাপ্য জীবপ্রবাহ বা কারণ-প্রবাহ দেখিতে পাই, অথচ এমন একটু স্থান দেখিতে পাই না যেখানে গিয়া স্থির হইতে পারি। এরূপ পশ্চাৎগমন আমারদের বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন রূপ আনুকূল্য করে না, অথচ অকারণ জীবপ্রবাহের বা সসীম কারণ-প্রবাহের অনন্তত্ব মানিয়া লইতে হয়। তর্ক শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সসীমের পশ্চাদ্ধাবনে উহার অন্তরালে প্রস্তাবিত বিষয়ের সদুত্তর প্রাপ্ত না হইয়া যখন আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকি, তখন আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ এক আদি কারণের দিকে আমারদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। তাঁহাতেই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই, ইহাঁকে ছাড়িয়া যে দিকে গমন করি, সেই দিকেই কুজ্ঝটিকা

আসিয়া মীমাংসার পথকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

ক্রমে সুস্পষ্ট বুঝিতে থাকি যে এই প্রকাণ্ড বিশ্বচক্রের আদি কারণ অসীম, অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয়, স্বাবলম্ব, সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বদর্শী। ইনি ধ্রুব সত্য সনাতন। ঋষিরা ইহাকে সকলের কারণ সকলের একমাত্র আধার ও নিদানভূত জানিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাসে প্রজ্বলিত হইয়া বলিয়া গিয়াছেন "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" কেবল তাঁহার কিরণে জগৎ সংসার প্রকাশিত হইতেছে। বাস্তব সত্ত্বা একমাত্র তাঁহারই।

বস্তুত অনাদিমৎ কারণ অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে এমনই সহজ ও স্বাভাবিক যে ইহার জন্য কোন রূপ প্রমাণ আবশ্যক করে না। ঈশ্বরের ক্ষমতা বা নৈপুণ্য যাহা সৃষ্টি-কৌশলে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিচায়ক বটে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস যারপর নাই স্বাভাবিক। সসীম জগৎ সংসারে তাঁহার অনুপম সৃষ্টি-চাতুরী এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ীকৃত করে এই মাত্র। নয়ন উন্মীলন করিলে স্থাবর জঙ্গম ভূচর খেচর সমুদয় জীব জন্তুই তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অন্তরে তাঁহার অস্তিত্বের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়া দেয়, তাঁহার অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে, তাঁহার উপর নির্ভরের ভাবকে প্রশস্ত করিয়া তোলে। যখনই আমরা সসীমকে দেখি, তখনই উহার অবলম্বন অসীমের সত্ত্বা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আপনার কক্ষপথ হইতে বিচলিত হইতেছে না, সূর্য্য পৃথিবীকে আপনার পথ হইতে রেখামাত্র স্খলিতপদ হইতে দেয় না। বৃক্ষ লতা পাদ দ্বারা রসাকর্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, নর নারী পশু পক্ষী ফল মূলাহারে জীবিত থাকে। মেঘ বারিধারা বর্ষণে শুষ্ক পৃথিবীকে সিক্ত করে। সূর্য্যের দারুণ উত্তাপে আকাশমণ্ডলে মেঘমালা সঞ্চিত হইতে থাকে। জলদরাশি বায়ুবেগে পর্ব্বতের বক্ষে আহত হইয়া জলরূপে পরিণত হইয়া নদ নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে। এইরূপে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে সূক্ষ্ম যোগে আবদ্ধ, কেহই স্বাধীন নহে। সকলেই অপরের মুখ চাখিয়া রহিয়াছে। সুতরাং একজন নিরবলম্ব কারণ বা পুরুষ ইহার পশ্চাতে থাকিয়া ইহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন। যে আপনি পরাধীন সে কেমন করিয়া আপনার বলে আপনি তিষ্ঠিতে পারে।

আমরা কোন স্বাধীন পুরুষকে দেখিতে পাই নাই বলিয়া কি তাঁর সত্ত্বা নাই। আদি কারণকে বিশেষ রূপে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই বলিয়া কি তাঁহার আস্তিত্ব নাই? তিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির বহুদূরে বর্ত্তমান বলিয়া কি তাঁহাকে অগম্যবোধে একবারে পরিত্যাগ করিব? তর্কশাস্ত্র ততদূর উঠিতে পারে না বলিয়া কি তাঁহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইব? হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর সে অসঙ্কুচিত ভাবে বলিবে যে ঈশ্বর-বিষয়ক সত্যান্বেষণের অন্যবিধ উপায় আমারদের বুদ্ধির মূলেই বর্ত্তমান। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের বিমল জ্যোৎস্নায় অন্তর্দ্দেশ আপনা হইতেই আলোকিত। সকল জড় আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার প্রখর আলোকে অন্তর্দ্দেশ জ্যোতিষ্মান রহিয়াছে। অনন্তের অসীম মহিমার প্রতিবিম্ব আপনা হইতেই হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে।

সকল দেশের সকল কালের সকল মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইহা সকল মনুষ্যে সমান পরিস্ফুট নহে। অসভ্য বর্ব্বরেরা মেঘ বজ্র, বায়ু বরুণের প্রচণ্ড ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ঈশ্বর বোধে তাহারদেরই অর্চ্চনা করে। অপেক্ষাকৃত সুসভ্যেরা আপনার সাদৃশ্যে গঠিত মৃণ্ময় ও দারুময় প্রতিমায় ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাহার স্তুতিবন্দনায় কৃতার্থম্মন্য হয়। কেহ বা মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত বা তাঁহার অবতার বোধে সাধনার পথকে অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া তোলে। জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ইহারদের অতীত জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি মানস উপচারে তাঁহাকে আরাধনা করিয়া, তাঁহার সহিত স্থায়ী অধ্যাত্মযোগ সংস্থাপনে ব্যাকুল অন্তরে সাধন তপস্যায় নিযুক্ত হন। মনুষ্য এইরূপে বিভিন্নপন্থী হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একবারে উদাসীন নহেন। যদি তিনি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার বা ধন সম্পদের অস্থায়ী ছায়ায় আপনাকে সুখী ও নিরাপদ জ্ঞান করেন, বিপদের ঘোর কশাঘাতে তাঁহার জ্ঞানের উদ্রেক হয়। তিনি ভগ্নতরী নাবিকের ন্যায় আপনাকে অসহায় দেখিয়া বিপদের কাণ্ডারী ধ্রুব সত্যের সাহায্য পাইবার জন্য সহজেই অগ্রসর হইতে থাকেন। বিপদের তীব্র ঘূর্ণা নাস্তিকগণের বিষম পরীক্ষার স্থল! এ পরীক্ষায় কাহাকেও জয়লাভ করিয়া নাস্তিকতার রাজ্য বিস্তার করিতে দেখা যায় না। যতকাল শরীরে বিলক্ষণ সামার্থ্য থাকে, যতকাল আপনার শক্তি সামর্থে পৃথিবীতে অশেষ সুখ সম্পদ, স্ত্রী পুত্র পরিবার বিপুল যশোমান খ্যাতি অর্জ্জিত হয়, ততকাল মনুষ্যের ঘোর মোহের অবস্থা। সে সর্ব্ব-সুখদাতা ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখিবে না, সে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। ক্রমে যখন একটি বন্ধুর বিনাশে, সামান্য যশোহানির সঙ্গে সঙ্গে অনিত্য জগতে অনিত্য সুখ শান্তির মধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হয়; তখন তাহার মোহনিদ্রার অবসানে চৈতন্যের আগম হইতে থাকে, আত্মার ক্ষুধা প্রদীপ্ত হইতে থাকে ও তাহার সকল প্রহেলিকা অন্তর্হিত হয়। এই জন্য মনুষ্য সম্পদ অপেক্ষা বিপদে, যৌবন অপেক্ষা বার্দ্ধক্যে, সবল অপেক্ষা দুর্ব্বল অবস্থায় তাঁহার দিকে ধাবমান হয়। যিনি পার্থিব সম্পদের পরিণাম পূর্ব্ব হইতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনের প্রারম্ভ হইতেই গম্য পথকে নিয়মিত করিয়া লইতে পারেন তিনিই ধন্য!

মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের বা বিশ্বাসের সত্বা বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে এক স্থূল বিশ্বাস মনুষ্য মাত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঘোর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন বর্ব্বর জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিবে ভাষার সম্পূর্ণ ব্যবহার তাহারদের মধ্যে স্থান পায় নাই, অথচ ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর শ্বাপদসঙ্কুল গাঢ় অরণ্য সমন্বিত এ পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছে? এ প্রশ্ন যে তাহারা কখন জিজ্ঞাসিত হইবে হয়ত মনে কখন নিমেষের মধ্যে তাহা স্থান দেয় নাই, স্তব্ধ হইয়া ক্ষণেকের জন্য অন্য কার্য্য বিস্মৃত হইল, একবার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিল, পরক্ষণেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আকাশকে দেখাইয়া দিল। আকাশ অপেক্ষা তাহার সম্মুখে অনন্তের পরিস্ফুট ছায়া

আর কোথা পাইবে। এই জন্যই তাঁহার অঙ্গুলি সহজেই আকাশকে দেখাইয়া দেয়।

ঐশ্বরিক জ্ঞানের এরূপ স্থূল বিশ্বাস মনুষ্য মাত্রেরই নিজস্ব ধন। এই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন মনুষ্যজাতির চেষ্টা ও যত্ন-সাপেক্ষ। জ্ঞানের ও শিক্ষার উন্নতির সহিত বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান পূর্ণাবয়ব লাভ করিতে থাকে। এই জন্যই মনুষ্য জাতির উন্নতির ইতিহাসের প্রতি অঙ্কে এই মত ও বিশ্বাসের বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। সামান্য বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যেমন কালসহকারে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞানের নৈসর্গিক বীজ কাল সহকারে স্ফূর্ত্তি লাভ করিলে ধ্যান ধারণা সাধন তপস্যার বিবিধ ক্রম তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়ীভূত হইতে থাকে। যে দেশে যে কালে এই জ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হইতে থাকে সেই দেশেই ঈশ্বরের যথার্থস্বরূপ মানব হৃদয়ে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের পথ জগতের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া দেয়। আমরা আর্য্য সন্তান। এই আর্য্যভূমি যে এক কালে সভ্যতার উন্নততম মঞ্চে আরোহণ করিয়া পরা বিদ্যার প্রকৃষ্ট চর্চ্চায় আপনাকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, এখানকার জ্ঞান বিজ্ঞান, চিকিৎসা বা দর্শন, কাব্য বা জ্যোতিষ, নাটক ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস ও সংহিতাই তাহার প্রকৃত পরীক্ষার স্থল। ধর্ম্মভাব ঈশ্বরপ্রেম আর্য্যসন্তান-গণের অস্থি মজ্জায় এমনই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল যে তাঁহারা যাহা বলিতেন যাহা করিতেন তাহা হইতে ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিতেন না। বৃক্ষের পত্রে পতঙ্গের পতত্রে হিমালয়ের গগনস্পর্শী উচ্চতায় সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিদ্যুতের চাক্‌চিক্যে, বজ্রের হৃদয়ভেদী নিনাদে, প্রভঞ্জনের দারুণ আঘাতে কেবল তাঁহারই বিকাশ দেখিতে পাইতেন।

ভূতত্ত্ব, রসায়ন,ভূগোল খগোল, জ্যোতিষ ও পদার্থদর্শনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতই আমরা জগতের মধ্যে একটি সুন্দর অভিপ্রায়ের পরিচয় পাইতে থাকি ; যতই আপাত-প্রতীয়মান বিশৃঙ্খলতার মধ্যে একটি শৃঙ্খলের সূত্র দেখিতে পাই ততই ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ততই ঈশ্বরের সুমহান মঙ্গলভাব অন্তরে বদ্ধমূল হইতে থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে, তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে নিষ্ঠা স্থাপন না করিলে, বিপদে শান্তি নাই, রোগে সান্ত্বনা নাই ; দুর্জ্জয় শোক অপনয়নের উপায় নাই, আত্মার ক্ষুধা তৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার উপর ঐকান্তিক বিশ্বাস দুর্জ্জয় মহা-প্রলয়ের তীক্ষ্ণবীর্য্য মৃদু করিয়া আনে, দীপ্তশীরা হইলে শান্তিবারি বর্ষণে উহার কঠোরতা নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। সকল জ্ঞান সকল বিদ্যা সকল তত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উহারদের পূর্ণতা সম্পাদন করে। তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে স্থিরনিশ্চয় হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞান ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে প্রধাবিত হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মনুষ্যের এমনই সহজ এমনই স্বাভাবিক যে ইহা অদ্যাবধি এই জ্ঞানগর্ব্বিত শতাব্দীর কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিরোধী নহে। এবং নিসংশয়চিত্তে ইহা বলা যাইতে পারে যে কোন কালে ইহা অপর বিদ্যার বিসম্বাদী হইয়া দাঁড়াইবে না। ঈশ্বর যখন জড় জগতের রাজা, প্রাণীরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর, সৃষ্টিকৌশলে তাঁহারই প্রদত্ত নিয়মাবলীর অতি অল্প অংশই যখন

মনুষ্যের সকল বিদ্যার আলোচনার ও উদ্ভাবনার বিষয়, কেবল একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছা যখন জগতে কার্য্য করিতেছে, তখন উভয়ের মধ্যে বিবাদের কারণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা আমাদের যৎসামান্য জ্ঞানে স্ফীত হইয়া আমারদের ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তকে কি তাঁহার ধ্রুব ও উজ্জ্বল সত্ত্বার পরিমাপক করিব, তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞানের তলস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইব। ঋষিরা তাঁহাকে স্বল্প জ্ঞান বুদ্ধির অতীত জানিয়া স্পষ্টতঃ বলিয়া গিয়াছেন "নৈষা-মতি তর্কেণাপনয়া" তাঁহারা পরীক্ষা যোগে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাকে তর্কের দ্বারা পাইবার উপায় নাই।"

যতই ভৌতিক জগতের কৌশলের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে থাকি, আত্মার ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে ততই ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার স্বরূপে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে থাকে। এই জন্যই পৃথিবীর চক্ষে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে জড়বাদ, প্রতিমাপূজা, অবতারবাদ ও পবিত্র ব্রহ্মপূজা স্থান পাইয়াছে। একমাত্র ব্রহ্মপূজাই পৃথিবীর জ্ঞানো.ত বয়সের ধর্ম্ম। যতই জ্ঞানালোচনা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকিবে, যতকাল সাধন তপস্যা ঈশ্বরচিন্তায় মনুষ্যের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা থাকিবে ততকাল পবিত্র একেশ্বরোপাসনা উন্নতমস্তকে রাজত্ব করিবে। কেহই ইহার পবিত্র মূর্ত্তিকে ম্লান করিতে পারিবে না।

পাপে কলঙ্কিত হইলে কাহার রুদ্র মূর্ত্তি আমারদের সম্মুখে দেখিতে পাই? গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কাহার উদ্যত বজ্র আমারদের মস্তকে পতনোন্মুখ দেখি? আমরা স্বাধীন প্রকৃতির জীব হইয়াও কাহার শাসনভয়ে অন্যায্য কর্ম্মের প্রারম্ভেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি? ন্যায় রাজ্যের ন্যায়দণ্ড কাহারও কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে তবে কেন আমরা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া অনুতাপানলে ভস্ম হইতে থাকি? ন্যায় কার্য্যের দিকে কেন বা আমরা সহজে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি? পৃথিবীর উপরে কি কোন রাজা নাই? আমারদের ন্যায় অন্যায় কর্ম্মের কি কেহ দণ্ডদাতা পুরস্কর্ত্তা নাই? আমরা কি আপন আপন প্রকৃতির স্রোতে অবাধে ভাসমান হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি? ইহা যদি সত্য হয়, তবে জগৎ বলিবে আমি মিথ্যা।

জড় জগৎ একই নিয়মে পরিচালিত হইয়া অনন্তের দিকে বেগে ধাবমান হইতেছে। এখানকার কোন বস্তুই অখণ্ড নিয়মাবলী হইতে রেখামাত্র বিচ্যুত হইবে না। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ একই নিয়মের দাস। তাহারা একই ভাবে একই নিয়মে একই বৃত্তের অন্তর্ভূত হইয়া জীবনের তাবৎকাল অতিবাহিত করিয়া দিয়া এখান হইতে চলিয়া যায়। তবে কি মনুষ্য সকল নিয়মের অতীত? যেখানকার কীট কীটাণু বালুকণার মধ্যে শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, সেখানকার জীবজগতের রাজা মনুষ্যের মধ্যে কি তদ্রূপ কোন শৃঙ্খলার সত্ত্বা নাই। মনুষ্য কি আপনার বলে আপনার ইচ্ছায় এখানে আসিয়া আপনার পরাক্রমে আপনার ক্ষমতায় জীবিত রহিয়াছে। তবে কেন জরামৃত্যু বাল্য যৌবন তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তবে কেন শারীরিক নিয়মভঙ্গে দেহপিঞ্জর অশেষ ব্যাধির আধার হয়। তবে কেন ন্যায়পথ হইতে বিচলিত হইলে হৃদয়ের তাড়না সহ্য করিতে হয়। ইহলোকে ধর্ম্মের পুরস্কার পাপের দণ্ড যথা-উপযুক্তরূপে প্রাপ্ত না হইয়া কেনবা স্থানবিশেষে অধার্ম্মিকের জয় ধার্ম্মিকের পরাজয় দেখিতে পাই। এইরূপ আপাত

প্রতীয়মান অসঙ্গতি কি পরকালকে অপেক্ষা করে না, ঈশ্বরের অস্তিত্বে ধ্রুব-বিশ্বাস তাঁহার ন্যায়পরায়ণতায় অবিচলিত নিষ্ঠা আছে বলিয়াই মনুষ্য সহস্র কষ্ট ক্লেশের মধ্যেও ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকে। এখানে ধর্ম্মের পুরস্কার প্রাপ্ত না হইয়াও অদৃশ্য পরলোকে ধর্ম্মের ন্যায্য পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করিতে থাকে।

আমরা দুর্ব্বল জীব, আমারদের পদে পদে বিঘ্ন পদে পদে বিপদ। বিপদের ভীষণ ভ্রূকুটীর মধ্যে আমরা তাঁহাতে নিরাপদ দুর্গ দেখিতে পাই। এখানকার সকল আশা ভরসা তিরোহিত হইলেও আমরা তাঁহাকে ছাড়ি না ইহাই আমারদের আত্মার প্রকৃতি। এই জন্যই ঘোর বিপদের সময় আমারদের ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে তাঁহার নাম সঘন উচ্চারিত হইতে থাকে। যখনই আমারদের দুর্ব্বলতা প্রতীয়মান হয় তখনই তাঁহার উপর নির্ভরের ভাব সহজেই মনে স্থান পায়।

অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির কার্য্য-কলাপে তাঁহার প্রতি আমারদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহজেই ধাবিত হয়। যখন আমরা অভ্রভেদী হিমালয়ে বা নীলাকাশে দৃষ্টি-পাত করি তখন উহার গাম্ভীর্য্য উহার উচ্চতা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। ঈশ্বরের স্তুতি বন্দনা ঘোর নাস্তিকেরও পাষাণসমান হৃদয়কে আকুল করিয়া তোলে। যদিও তাহা সাময়িক, তথাপি উহার অজেয় ক্ষমতা মর্ম্মের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিবেই করিবে। ঈশ্বর-বিষয়ক সঙ্গীতের অপরিমেয় ক্ষমতা নাস্তিককেও যেন পৃথিবীর উপরিতন জগতে লইয়া যায়। ঈদৃশ দৃষ্টান্তেরও অপ্রাচুর্য্য নাই। সেই জন্যই বলা যাইতেছে যে মহান ও অনন্তের দিকে মনুষ্যের স্বাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধা নিহিত রহিয়াছে। এবং ঈশ্বরের মহান ভাবে বিশ্বাসই এই ভক্তি শ্রদ্ধাকে চিরতৃপ্ত করিতে পারে।

যদি বা আমরা কখন তর্কদ্বারা তাঁহার অস্তিত্বে উপনীত হইবার চেষ্টা করি, এবং বিফল-মনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হই তবে সে দোষ আমার ক্ষীণ বুদ্ধির অনধিকার চর্চ্চার। যাঁহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ তাঁহাকে নিজ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই যে এরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব আমার ক্ষুদ্র শক্তির দূরবগম্য হইল বলিয়া কি তাহার বিষয়ে সন্দিহান হইব? আমরা মর্ত্ত্যের ধূলিকণা হইয়া কি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা বিধাতাকে উড়াইয়া দিব? তিনি আমারদের জ্ঞানের মূলে অথচ আমারদের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা তাঁহাকে অঙ্গুলি দ্বারা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তাঁহার অস্তিত্ব-জ্ঞান মনুষ্যের এমনই স্বাভাবিক তিনি তর্কের বাহিরে এমনই উজ্জ্বলরূপে স্থিতি করিতেছেন যে কোন ধার্ম্মিক কবি তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "সে না হলে আপনার—শুনিয়া তর্ক বিচার, বুঝিলে মন নিশ্চয়, প্রাণ কেন বুঝে না"। তিনি আমারদের প্রাণের মূলে রহিয়াছেন এত বড় ব্রহ্মাণ্ড যদি অন্ধশক্তির কার্য্য হয়, জড়-জগতের ও প্রাণীরাজ্যের মধ্যে এত সূক্ষ্ম কৌশল দেখিয়া যদি এরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয় তবে জানি না ইহা অপেক্ষা কি অধিক অসম্ভপর হইতে পারে।

কালনা ব্রাহ্মসমাজ।

কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৯।

আজ যাঁহার উপাসনার জন্য সকলে সমবেত হইয়াছি তিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ নিরাকার নির্ব্বিকার। কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে প্রায় প্রতি গৃহেই মূর্ত্তি-পূজা হইত কিন্তু এক্ষণে সুশিক্ষিত সাধু-লোক মাত্রই বুঝিতেছেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মের পূজা ব্যতীত মুক্তি প্রাপ্তির অন্য কোন পথ নাই; তাই আজ এস্থলে—এই পবিত্র দেব-মন্দিরে এত লোকের সমাগম। যিনি চেতনং চেতনানাং তিনি আমাদের আ-ত্মায়। তাঁহাকে পাইবার জন্য বাহ্য কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই, এই হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে—এই আত্মার মধ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর। শরৎকালের ন্যায় পূজার প্রশস্ত কাল আর নাই। এখন আকাশ নির্ম্মল, চন্দ্র শুভ্র কিরণে চারি দিক আলোকিত করিতেছে, পথ কর্দ্দম শূন্য, জল স্বচ্ছ, শরৎ শ্রী বিকসিত পদ্মনেত্রে যেন বিশ্বের শোভা দেখিতে-ছেন। বায়ু মৃদু মন্দ। প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য সহজেই আমাদের মনকে প্রসন্ন করিয়া আজ এই ব্রহ্মোৎসবে প্রবৃত্ত করিয়াছে। যিনি এই প্রকৃতির স্রষ্টা তিনি আমাদের অন্তরে। শরৎ কালের নির্ম্মলতা যেমন জলস্থল আকাশের শোভা সেইরূপ নির্ম্মলতাই আত্মার চির দিনের শোভা। আমাদের প্রত্যেককেই যত্নপূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। জল স্বচ্ছ না হইলে কি তাহাতে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়? সেইরূপ বুঝিও আত্মাকেও স্বচ্ছ করা আবশ্যক। নচেৎ তাহাতে ব্রহ্মের রূপ প্রতিভাত হয় না। আমাদের যা কিছু সাধন সমস্তই কেবল এই জন্য। আমরা নির্ব্বোধের ন্যায় বহির্বিষয়েই ধাবিত হই তদ্দারাই আত্মায় কালিমা সঞ্চিত হয়। সেই জন্য সাধনের পূর্ব্ব-সোপান যোগ। এই যোগ শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তিনিরোধ। ইহা সিদ্ধ করিতে না পারিলে আত্মা কখন স্থির হয় না। আজ আমরা শরতের বাহ্য শোভায় ব্রহ্মে আকৃষ্ট হইয়াছি এই সঙ্গে যদি আমাদের চিত্ত স্থির থাকে তবে নিশ্চয়ই আজকার উৎসবের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। নিঃসঙ্গতাই চিত্তস্থৈর্য্যের হেতু। বহি-র্ব্যাপারে মন ক্রমশ আসক্তিশূন্য হইলে তাহার স্থৈর্য্যলাভ সহজ হইয়া থাকে। প্রীতির পাত্রকে প্রীতি, স্নেহের পাত্রকে স্নেহ কর, সংসারের যথাযথ ভোক্তৃভোগ্য ব্যবহার নিষ্পন্ন হউক কিন্তু প্রত্যেকের তৎতৎ বিষয়ে আসক্তিদোষ পরিহারের জন্য দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সাধনের কোন অঙ্গই সিদ্ধ হয় না। আ-মরা বহুদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজে যোগরক্ষা করিতেছি, আচার্য্যের অন্তর্ভেদী উপদেশ শ্রবণ করিতেছি কিন্তু সময়ে সময়ে আত্ম-পরীক্ষায় দেখিতে পাই আমি এক পদও অগ্রসর হই নাই। মুক্ত কণ্ঠে কহিতেছি ইহার কারণ সংসারে ঘোরতর আসক্তি। আমরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। মেঘস্থ তুষার বিন্দুতে যেমন অনন্ত আকাশ দর্শন হয় সেইরূপ আমাদের এই ক্ষুদ্র আত্মাতে সেই মহান আত্মাকে দেখিতে হইবে! কার্য্য অতি কঠিন। কিন্তু যে পথে যাইলে সিদ্ধিলাভ হয় আমরা সেই পথ জানিয়াও জানি না দেখিয়াও দেখি না। সেই পথের প্রথম সোপান এই নিঃসঙ্গতা। সকল বেদ সকল শাস্ত্র ভূয়োভূয় ইহারই উপদেশ করিতেছেন।

ব্রাহ্মগণ! জড় মূর্ত্তিপূজায় আত্মার

জড়তা ও অস্বাস্থ্য আইসে তাই আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া বেদবেদান্তোক্ত ব্রহ্মের উপাসক হইয়াছি। কালে ইহা আমাদের সকল প্রকার জড়তা ও অস্বাস্থ্য দূর করিয়া অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে। কিন্তু আজ কএক দিন হইল বঙ্গের গৃহে গৃহে যে শক্তিপূজার উৎসব হইয়া গেল মনে কর কি বাহ্য মৃৎ পাষাণ বৃথা বহু আড়ম্বর ইহার প্রাণসর্ব্বস্ব? না কখনই না। আমরা অনন্ত নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের মৃৎ বা পাষাণ মূর্ত্তি কল্পনা-পথে আনিতে কুণ্ঠিত হই। অগ্নি মূর্দ্ধা, দ্যুলোক যাঁর মস্তক, চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ চন্দ্র সূর্য্য যাঁর চক্ষু, দিশঃ শ্রোত্রে দিক সকল যাঁর শ্রোত্র, বাক্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ বিবৃত বেদ যাঁহার বাক্য, পদ্ভ্যাং পৃথিবী পৃথিবী যাঁর পদ, হৃদয়ং বিশ্বমস্য এই বিশ্ব যাঁর হৃদয়, সেই বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহু ব্রহ্মের ব্যাপ্য মূর্ত্তি যে কি আমরা ধ্যানে জ্ঞানে কিছুতেই তাহা পাই না। সুতরাং তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই গৃহে গৃহে যে এই শক্তিপূজার উৎসব হইয়া গেল ইহাতে আমাদের ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য দুইই আছে। আমরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। মূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে আমাদের ত্যাজ্য কিন্তু এই মূর্ত্তিপূজার আনুসঙ্গিক এমন সকল ব্যাপার আছে যাহা আমাদের গ্রাহ্য। দেখ ইহার ভিতর অনেক সামাজিক উন্নতি সংস্কৃষ্ট রহিয়াছে। সংক্ষেপে বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে বর্ত্তমানে এই দেশে যা কিছু ভাল যা কিছু শ্রেয় এই শারদীয় উৎসব অনেকটা তাহা রক্ষা করিকরিতেছে। ইহা দ্বারা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, শাস্ত্রজ্ঞদিগের শ্রেণী রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে। ইহারই প্রভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি এক প্রকার স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সম্বৎসরের সঞ্চিত মনোমালিন্য নষ্ট করিয়া ইহা পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করে এবং জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সামাজিক উন্নতি সাধনের পক্ষে ইহার কোনটীই ত্যাজ্য হইতে পারে না। আমরা জাতিতে হিন্দু, আমাদের ধর্ম্ম বেদ বেদান্তোক্ত প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, আমরা বুঝিয়াছি যাঁহাকে মন মনন করিতে পারে না, বাক্য নির্দ্দেশ করিতে পারে না অথচ মন ও বাক্য যাঁহা হইতে স্বস্ব শক্তিলাভ করিয়াছে তিনিই ব্রহ্ম, নেদং যদিদমুপাসতে আর নামরূপ বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। আমরা আত্মশক্তি ও শাস্ত্র মুখে জানিয়াছি মূর্ত্তিপূজায় আমাদের কল্যাণ নাই কিন্তু আজ উৎসবের দিনে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না এই সমস্ত মূর্ত্তিপূজার সহিত মনুষ্য সমাজের পক্ষে যাহা কিছু প্রকৃত হিতকর কার্য্য সংস্কৃষ্ট রহিয়াছে দেশকাল বিচার পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতে যত্ন করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি আমাদের প্রতিগৃহে পূর্ব্বপিতামহগণের আরাধ্য নিরকার জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত হউক। বর্ষে বর্ষে এই ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে আমাদের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে নিরন্নকে অন্নদান ও বিবস্ত্রকে বস্ত্রদান কর। দ্বেষহিংসা বিস্মৃত হইয়া সকলকেই স্নেহের আলিঙ্গন দেও, ভক্তির পাত্রকে প্রণিপাত কর, দেশের শিল্প সাহিত্য ও গীতবাদ্যের উন্নতি ইহার অঙ্গ করিয়া লও, দৈহিক বলবীর্য্য রক্ষার জন্য ব্যায়ামের উৎসাহ দেও, শক্তি অনুসারে

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকদিগের বৃত্তি বিধান কর এবং এদেশের শারদীয় উৎসবের সহিত জন সাধারণের যাকিছু সৎ ও শ্রেয় সংস্পৃষ্ট রহিয়াছে ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লও এবং ব্রাহ্ম সাধারণ একমত হইয়া এই সুপ্রশস্ত শরৎকালে ব্রহ্মোৎসব প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আত্মোন্নতির জন্য অমূর্ত্তকে পূজা করিতেছ সেইরূপ দেশহিতকর সমস্ত কার্য্য ইহার সহিত মিলিত করিয়া লও। এইরূপে কিছুকাল চল দেখিবে তুমি ব্রহ্মের নামে যে বিজয়-নিশান তুলিবে তাহার তলে দেশের সমস্ত নরনারী আসিয়া যোড় করে দণ্ডায়মান হইবে। তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনং কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া আত্মোন্নতি করিলেই সাধনের সকল অঙ্গ সিদ্ধ হইল না, ইহার সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য্য চাই। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিও না, ব্রহ্মের আহ্বানে সংসারে আসিয়াছ, ব্রহ্মের আদেশে সংসারের কার্য্য করিবে, তিনি প্রভু তুমি ভৃত্য, তবে সংসারের কার্য্যে কেন তোমার অভিমান হইবে, অগ্রে বলিয়াছি নিঃসঙ্গ হও সংসারের প্রতিকার্য্যে এই প্রভুভৃত্য ভাব রক্ষা করিয়া যদি চলিতে পার তাব যথার্থতই তুমি নিঃসঙ্গ। সঙ্গ হইতে বাসনার উৎপত্তি হয় সকল শাস্ত্র এই বাসনা ছেদনের জন্য ভূয়োভূয় উপদেশ করিয়াছেন। আমরা যেন এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সাধনের পথে অগ্রসর হই। ইহাতে আমাদের নিজের মঙ্গল এবং আমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উত্থিত হইয়া পরস্পরকে যে প্রীতিবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে এই বাসনার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে আর তাহা ঘটিবে না ইহাতে জগতের মঙ্গল।

পরমাত্মন্! দিন তো অবসান হইতেছে। কবে চক্ষুর এই দুই খানি কবাট পড়িয়া যাইবে, দিন থাকিতে এই দীনকে দর্শন দেও, সম্মুখে ঘোর অন্ধকার, ভবিষ্যৎ যে কি আমরা কিছুই জানি না, তুমি সহায় হও এবং আমাদের হস্তধারণ করিয়া লইয়া চল। নাথ! তুমিই আমাদের একমাত্র আশা ও ভরসা।

দেবগৃহে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১১ই মাঘ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

জগৎপিতা পরমেশ্বর সকল জীবকে আনন্দ বিতরণ উদ্দেশে জগৎ সৃজন করিয়াছেন। প্রথমে কিছুমাত্র ছিল না। প্রেমাগ্নি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল আর এই জগতের সৃষ্টি হইল। সকল জীব সর্ব্বদা আনন্দ ভোগ করিতেছে। মনুষ্য অন্য জীবের ন্যায়ও আনন্দ ভোগ করিতেছে। আলোক, বায়ু ও জল যেমন মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না তেমনি ঈশ্বরপ্রদত্ত সার্ব্বভৌমিক সহজ আনন্দ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না। মনুষ্য যেমন মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না বলিয়া আলোক বায়ু ও জলের উপকারিত্ব লক্ষ্য করে না তেমনি সেই সহজ ধারাবাহিক নিত্য আনন্দ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না বলিয়া তাহা লক্ষ্য করে না। দুঃখই তাহার মনে অধিক লাগে। আনন্দই আত্মার প্রকৃতি। আনন্দই মনুষ্যের জীবন। আনন্দ না থাকিলে মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না। মনুষ্য যে আনন্দ সর্ব্বদা উপভোগ করে তাহা এক এক সময় অত্যন্ত প্রগাঢ় ভাব ধারণ করে। সে সময় উৎসবের সময়। লোক পুত্রের জন্ম উপলক্ষে উৎসব করে। বিবাহ উপলক্ষে উৎসব করে। জয়লাভ

উপলক্ষে উৎসব করে। সকল আনন্দকর ঘটনা উপলক্ষে উৎসব করে। কিন্তু সকল প্রকার উৎসব অপেক্ষা ধর্ম্মোৎসবে মনুষ্যের আনন্দ যেমন প্রগাঢ় ভাব ধারণ করে এমন অন্য কোন উৎসবে নহে যেহেতু ধর্ম্ম মনুষ্যের অতি প্রিয় পদার্থ। মনুষ্য ধর্ম্মোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে অত্যন্ত দূর হইতে প্রতি পদে পদে প্রণিপাত আরম্ভ করিয়া তীর্থ যাত্রা কার্য্য সমাধা করে। মনুষ্য ধর্ম্মের জন্য সকল ব্রত অপেক্ষা কঠিন চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করে। মনুষ্য ধর্ম্ম জন্য ভীষণ নির্জ্জনারণ্যে বাস করে। ধর্ম্ম যখন মনুষ্যের সকল পদার্থ অপেক্ষা প্রিয়, তখন ধর্ম্মোৎসব সময়ে যে তাহার আনন্দ অত্যন্ত ঘনীভূত আকার ধারণ করিবে তাহার সন্দেহ কি? ধর্ম্মোৎসব অত্যন্ত উপকারী পদার্থ। সম্বৎসর যাহার আত্মা শুষ্ক থাকে ধর্ম্মোৎসব সময়ে তাহাও সরস হয়। ধর্ম্মোৎসব কালে কঠিন আত্মাতেও ধর্ম্মের বীজ হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বীজ পরে ক্রমে ফুল ফল বিশিষ্ট মহাদ্রুমে পরিণত হয়। কিন্তু এই ধর্ম্মোৎসবের উপকারিত্ব লাভ করিবার জন্য তিন প্রকার মদ পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহা না হইলে তাহার সম্যক উপকারিত্ব লাভ করা যায় না। সেই তিনটি মদ কি না বিদ্যা মদ, ধন মদ ও ধর্ম্ম মদ। বিদ্যা মদ ও ধন মদের কথা লোক সর্ব্বদা বলে। সে বিষয়ে কিছু বলিব না। ধর্ম্ম মদ বিষয়ে বলিব। ধার্ম্মিক বলিয়া যে একটি অহঙ্কার জন্মে তাহারই নাম ধর্ম্ম মদ। এই মদ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের দ্বারে না আইলে ঈশ্বর, উৎসবের সম্যক উপকারিত্ব প্রদান করেন না। আমি পাপীর পাপী অতি হেয় পদার্থ এই রূপ দীন ভাবে অতি বিনম্র ভাবে তাঁহার উৎসব ক্ষেত্রে না আগমন করিলে উৎসবের উপকারিত্ব সম্যক রূপে লাভ করা যায় না। ধর্ম্ম মদ এমনি খারাপ যে বরং ধন মদ বিদ্যা মদের পার আছে, ধর্ম্ম মদের আর পার নাই। উৎসবের উপকারিত্ব সম্যক রূপে লাভ করিবার জন্য আর একটি জিনিস চাই। সেইটি উৎসবানন্দের জন্য ব্যগ্রতা পরিত্যাগ। তেমন আনন্দ হচ্চে না, তেমন আনন্দ হচ্চে না এমন করিলে উৎসবানন্দ আসে না। লোকে যেমন শীতকালে রৌদ্র সেবন সময়ে রৌদ্রকে আস্তে আস্তে শরীরের উপর কাজ করিতে দেয়, তেমনি, উৎসব সময়ে সেই সংসার অন্ধকারের অতীত আদিত্যবর্ণ দেবাত্ম-শক্তির কিরণকে আত্মার উপর আস্তে আস্তে কাজ করিতে দিতে হয় তাহা না হইলে সম্যক্‌রূপে উৎসবানন্দ মনে উদিত হয় না।

অদ্য কি আনন্দের দিন! যিনি আমাদিগের প্রাণসখা, যাঁহার নাম করিবা মাত্র চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হয়, অদ্যকার উৎসব তাঁহারই উৎসব। পৃথিবীর যে যেখানে ঈশ্বরপ্রেমী আছেন তাঁহাদিগের সকলকে আমি এই উৎসবে আহ্বান করিতেছি। সকল বয়সের ঈশ্বর-প্রেমীকে এই উৎসবে আহ্বান করিতেছি। কুমার কুমারী, নবীন নবীনা, প্রবীণ প্রবীণা! তোমরা সকলে ভক্তিপুষ্প সম্ভার হস্তে লইয়া এই উৎসব ক্ষেত্রে আগমন কর। যিনি সমস্ত জগতের অধিপতি অদ্যকার উৎসব তাঁহারই উৎসব অতএব অচেতন সচেতন সমস্ত জগৎকে আমি অদ্যকার উৎসবে আহ্বান করিতেছি। হে অচল ঘন, গহন! তোমরা এই উৎসবে যোগ দিয়া তাঁহার গুণ গান কর। হে রবি, চন্দ্র, তারা! তোমরা এই উৎসবে যোগ দিয়া তাঁহাকে আনন্দে

গান কর। সকল তরু রাজি ফুল ফলে সাজিয়া এই উৎসবে যোগ দান করিয়া তাঁহাকে গান কর। ভেরি, তূরী, ঝাঁজরী, ঢক্কা, জয় ঢক্কা। তোমরা সম্মিলিত হইয়া একটি মহান্ নাদ উৎপাদন কর যেহেতু আমাদিগের নাথ মহান। মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ মুরলী, রবাব, এস্‌রাজ, সেতার, বাহুলীন! তোমরা সম্মিলিত হইয়া একটি মধুর নিক্কন উৎপাদন কর যেহেতু আমাদিগের প্রিয়তম অতি মধুর। মর্ত্তলোকবাসী সকল মনুষ্য! তোমরা এই সকল যন্ত্রের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন কর। বিহঙ্গ কুল গাও আজি মধুরতর তানে। জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে, জগৎ পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে। মন হৃদয় মিলিয়ে সব সাথে ডাক নাথ ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বর্ষশেষ। প্রত্যেকের জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ শুক্রবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্ন প্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা বর্ত্তমান ১৮১০ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে ১৮১১ শকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল বর্ত্তমান চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইবে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া ১৮১১ শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।